ছন্দ পতন

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ কথা সাহিত্যিক
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের
ভূমিকা সম্বলিত

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক
শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়
মুসাপুর বিবেকানন্দ বুক স্টল
হরিপাল পোঃ, হুগলী

দুই টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি-প্রেস
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

স্বর্গত পিতা
দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও
স্বর্গীয়া জননী
সরোজকুমারী চট্টোপাধ্যায়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

রাখি পূর্ণিমা, ১৩৫৭
ইলাহিপুর, হুগলী

শয্যাশায়ী। আবার এলেন। আবার এলেন! প্রতিবাদ নাই, অভিযোগ নাই—আশ্চর্য্য মানুষ! আমি পড়লাম রচনাগুলি। পূর্বেই অনুমান একটা করেছিলাম, সে অনুমান সত্য প্রমাণিত হ'ল। সমস্ত রচনার মধ্যে অন্য কিছু থাক বা না থাক, দেশকে সমাজকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসার পরিচয় আছে; অতি ব্যগ্র একটি কল্যাণ কামনার পরিচয় অন্তরকে স্পর্শ করে। আমি স্বীকার করি—সাহিত্যের পক্ষে এ পরিচয় বড় পরিচয় নয়—এ পরিচয় স্রষ্টার এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্যের পরিচয়ে সাহিত্যিক পরিচিত হন, সাহিত্যিকের পরিচয় এখানে গৌণ।

ছন্দ পতন, হে বন্ধু বিদায়, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি গল্পে ওই একটি অকপট কল্যাণকামী মানুষের কল্যাণকামনাটাই বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। রসোত্তীর্ণ হয়ে সাহিত্য হিসাবে পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। তবুও আমার দ্বিধা হ'ল না। পঞ্চাননবাবুর অভিজ্ঞতা অনেক, তিনি দেশকে জানেন, মানুষকে দেখেছেন—ভালো বেসেছেন, তাঁর পুঁজি আছে। এবং তাঁর সেই অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা আছে—যা থাকার জন্য আমি জীবনে নিরভিমান ও অদমিত চিত্তে সকলের পিছনে থেকেও পথ চলবার প্রেরণা পেয়েছি। অভিজ্ঞতা আছে—তিনি যদি এখন রস-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে আজ যে প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশা নিয়ে তাঁকে সর্ব সমক্ষে পরিচিত ক'রে দিচ্ছি—সে প্রত্যাশা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ব্যক্তি হিসাবে যে শ্রদ্ধা আজ দিলাম, সার্থক সাহিত্যিক হিসাবেও সে শ্রদ্ধার তিনি অধিকারী হবেন এ কথা বলতে দ্বিধা করছি না। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে, পথে বিঘ্ন বিপত্তি অনেক—আজ আমি তাঁকে আমার অনুভূত অকপট সত্যের ভূমিকা রচনা করে সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত ক'রে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করছি। ইতি—

টালা পার্ক
ভাদ্র—১৩৫৭

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

ছন্দ পতন পুস্তকের অধিকাংশ গল্পই প্রথমে মাতৃভূমি, মন্দিরা, পূর্ণিমা দুন্দুভি, আযরত্ন প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর পরম শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের এবং পরম প্রীতিভাজন সোদর প্রতীম সাহিত্য রসিক শ্রীভবেন্দ্রনাথ ঘোষের আগ্রহ, উৎসাহ, চেষ্টা ও সাহায্যের ফলে এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইলে এই ঋণ শোধ হইবে না! শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসুশীলকুমার দত্ত, শ্রীপঞ্চানন ভড়, স্নেহভাজনীয়া কুমারী বাসন্তী ভট্টাচার্য প্রভৃতি নানাভাবে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়া গল্প রচনায় সাহায্য করিয়াছেন, সকৃতজ্ঞ চিত্তে চিরকাল তাঁহাদের নিঃস্বার্থ প্রীতির স্মৃতি বহন করিব! আরও অনেকের কথাই আমার মনে জাগিতেছে, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহাদিগকে ছোট করিতে চাহি না!

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক, যাঁহার অমর লেখনীতে বাংলা দেশের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ ও জীবন যাত্রার খুঁটিনাটি কথা সার্থকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সত্যিকার গণ-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন! তাঁহার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা নাই!

শক্তি প্রেসের কর্মী শ্রীঅজিতকুমার বসু ও শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহৃদয় ব্যবহার ও তৎপরতার ফলেই এত শীঘ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। এজন্য তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি!

পরিশেষে নিবেদন—আমি 'অন্ধকার' কাব্যগ্রন্থ ও 'রাত্রির যাত্রী' উপন্যাস লেখক শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় নহি, আমি শ্রীহীন 'পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়' এবং আমার বর্তমান ঠিকানা—ইলাহিপুর, হুগলী।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'শ্রী' যুক্ত থাকিয়া উত্তরোত্তর বংগ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন—ইহাই কামনা।

রাখি পূর্ণিমা, ১৩৫৭
ইলাহিপুর, হুগলী

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

ছন্দ পতন

১

স্নীতিকুমারের অতীত ইতিহাস কুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট, কিন্তু বর্তমানের ইতিহাস মধ্যাহ্ন দিবালোকের মত সুস্পষ্ট-উজ্জ্বল! এখন সে খ্যাতনামা সাহিত্যিক, অনেকেই তাহার প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহার দুইটা কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ দেখায়, তাহার রচনার জন্য সম্পাদকের নিকট হইতে তাগিদ-পত্র ও টাকা আসে। আগে তাহার কেমন একটা লোভাতুর লাজুকতা ছিল; এখন সে সপ্রতিভ কিন্তু সংযমী। সে যেন তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিয়াছে, তাই অপরের নিন্দা-প্রশংসায় সে আর তেমন বিচলিত বা আনন্দিত হয় না। পুরাবৃত্ত, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, লোকসাহিত্য প্রভৃতি লইয়াই তাহার কারবার। নরনারীর প্রেম-বিরহ লইয়া গতানুগতিক পন্থায় যে সব উপন্যাস বা নাটক লেখা হয়, সে-সবের প্রতি তাহার চিত্ত বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব জগতে যে এগুলির কোন মূল্য আছে, তাহা সে ভাবিতেই পারে না।

বাংলা সরকারের অস্বাভাবিক-অবস্থা-সুলভ ইস্তাহার অনুসারে যাঁহারা কলিকাতা ছাড়িয়া পল্লী অঞ্চলে আসিয়া আস্তানা গাড়িয়াছেন, তাঁহাদের কোন এক পরিবারের একটি অষ্টাদশী সাহিত্য অনুরাগিনীর দৃষ্টি সুনীতিকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। দূর হইতে যাঁহার প্রবন্ধের ভাষা, বর্ণনা-মাধুর্য ও রচনার রীতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করিত, তাঁহার বাসভবন খুব নিকটেই জানিয়া মেয়েটী আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। সুনীতিকুমারের সম্বন্ধে সে খুঁটিনাটি অনেক প্রশ্নই করিল। তাঁহার লেখায় ভূয়োদর্শন ও চিন্তাশীলতার ছাপ থাকিলেও বয়সে তিনি যুবক জানিতে পারিয়া মেয়েটীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার সহিত দেখা

করিয়া আলাপ-আলোচনা করিতে সে উন্মুখ হইয়া উঠিল। কিন্তু দেখিয়া সে আশ্চর্য হইল যে, সুনীতিকুমারের গ্রামাঞ্চলের লোকেরা তাঁহার প্রসংগে বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না! সহর হইতে আগতা এই শিক্ষিতা তরুণীটিকে সুনীতিকুমারের সম্বন্ধে এতো খুঁটিনাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া গ্রামবাসীদেরও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহাদের নিকট সুনীতিকুমারের মর্যাদা একটুখানি বাড়িল, লোকটা তাহা হইলে নেহাৎ বইপাগলা নয়? ভিতরে পদার্থ আছে!

বিকাল বেলা। আকাশ অনেকক্ষণ হইতে মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, এখন প্রবল বেগে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝড় বৃষ্টির হাত হইতে বই কাগজ বাঁচাইবার জন্য দরজা বন্ধ করিতে আসিয়া সুনীতিকুমার দেখিল, একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে সিক্ত বসনে তাহার ঘরের দিকে আগাইয়া আসিতেছে, তাহার সৌন্দর্য চোখ ভরিয়া দেখিবার মতো। সে বিস্মিত হইলেও বেশ সহজ ভাবেই প্রশ্ন করিল: বৃষ্টিতে ভিজে গেচেন দেখচি, বেড়াতে বেরিয়েছিলেন বোধ হয়? আসুন ভেতরে—

বলিয়া একখানি চেয়ার দেখাইয়া মেয়েটিকে বসিতে ইংগিত করিল এবং শুকনা কাপড় ও আলো আনিবার জন্য ভিতরের খোলা দরজার দিকে পা বাড়াইতেই মেয়েটী কণ্ঠস্বরে যেন বিশ্বের মাধুর্য ঢালিয়া প্রশ্ন করিল: কোথায় যাচ্চেন?

আপনার জন্যে কাপড় আনতে।

না থাক্, আপনি বসুন।

কাপড় ছাড়বেন না?

অনর্থক, বৃষ্টি থামলেই আমি চলে যাবো। ততক্ষণ আপনার সংগে আলাপ করি।

সুনীতিকুমার মেয়েটির সিক্ত পরিচ্ছদের পানে চাহিয়া কথা বলিতে ঈষৎ সংকুচিত হইতেছিল। মেয়েটী বুঝিতে পারিলেও গ্রাহ্য করিল না।

প্রশ্ন করিল ঃ আপনিই স্নীতিবাবু না? সাময়িক পত্রিকায় আপনারই রচনা ছাপা হয়?

প্রশ্নের ধরণে বিব্রত হইবার কথা, কিন্তু স্নীতিকুমার ঘাড় কাত করিয়া স্বীকার করিল। মেয়েটী বলিয়া চলিল ঃ আপনার লেখা আমি নিয়মিত ভাবে পড়ি এবং আনন্দ পাই। আজ আপনার সংগে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম!

সৃষ্ট বিষয়ের প্রশংসা করিলে কে না আনন্দিত হয়? স্নীতিকুমারও হইল। কিন্তু বহুদিনের নিরলস সাধনায় সে আপন চিত্তের কিছুটা সমতা আনিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই কুণ্ঠিত হাস্যে বলিল ঃ আপনার অনুগ্রহ, কিন্তু এখনও আপনার পরিচয় পেলাম না?

আমাদের বাড়ী কলকাতায়, সম্প্রতি এখানে এসেচি।

আপনার নাম?

আমার নাম?—বলিয়া মেয়েটী ঈষৎ হাসিল, তারপর বলিল ঃ মীরা দেবী।

মীরা দেবী? আপনি কি 'অর্চনা'য় কবিতা লেখেন?

মীরা হাসিল। আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলিল।

ইতিমধ্যে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। মীরা উঠিবার উপক্রম করিতেই স্নীতিকুমার বলিল ঃ একটু বসুন, আপনাকে চা এনে দিই।

মীরা সম্মতি জানাইল।

স্নীতিকুমার চা আনিবার জন্য উঠিয়া যাইতেই মীরা নব পরিচিত সাহিত্যিকের সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রস্থল এই ঘরখানার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। স্বল্পালোকে প্রায়ান্ধকার ঘরের কিছুই প্রায় নজরে পড়ে না। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর দেখা গেল, টেবিল চেয়ার, আলমারি, কাঠের র‍্যাক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বই কাগজ প্রভৃতিতে

ঘরখানা যেন বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। সবই কেমন যেন অগোছালো। সাহিত্যিকের ছন্নছাড়া অগোছালো হওয়াটা যেন একটা নিয়মের মধ্যে। ব্যতিক্রম হয়তো আছে, কিন্তু সেটা খুব কমই নজরে পড়ে। ইতিমধ্যে আলো আসিয়া পড়িল। হঠাৎ যেন স্থনীতিকুমার আবিষ্কার করিল, ঘরখানা সত্যিই বড় বিশ্রী হইয়া আছে। কতবার দিদি এই ঘরখানা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়াছে, বই কাগজ গুছাইয়া দিয়াছে; কিন্তু কতক্ষণ সে পরিচ্ছন্নতা? আবার যে কে সেই। কিছুতেই স্বভাবটাকে বদলাইতে পারে না স্থনীতিকুমার। আজ কিন্তু এজন্য তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল।

একটু পরে তাহার দিদি চা লইয়া আসিল।

পরস্পরের মধ্যে হাসিমুখে নমস্কার বিনিময় হইল। আলাপ আলোচনা স্থরু হইয়া গেল মীরা ও স্থনীতিকুমারের দিদির মধ্যে কেমন অকুণ্ঠিত ভাবে। অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ জমিয়াও উঠিল। রাত হইতেছিল বলিয়া মীরা সেদিনকার মতো বিদায় গ্রহণ করিল। দিদির নির্দেশ মতো স্থনীতিকুমার আলো লইয়া অগ্রসর হইল তাহাকে পৌছাইয়া দিতে।

২

কয়েক দিন পরের কথা। স্থনীতিকুমারের জীবনে কি কোন পরিবর্তন আসিয়াছে? সে কোন দিন যাহা করে নাই, তাহাই করিতে-ছিল অর্থাৎ কবিতা লিখিতেছিল।

কবিতা রচনার পর হইতেই স্থনীতিকুমার আত্মবিশ্লেষণ করিয়া চলিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে কি এমন অভূতপূর্ব ভাবের তরংগ উঠিল, যাহাতে তাহার এতোদিনকার যত্নে গড়া চিত্তের সমতা সংযম সব ভাসিয়া গেল? সে ত এতোদিন অবিচলিত নিষ্ঠার সংগে বাণীর সেবা করিয়া আসিয়াছে, কখনও ত এমন বিচলিত হয় নাই! কোথা হইতে এই

নূতন অভাব-বোধ তাহার হৃদয়ে জাগিল, যাহা ক্ষণে ক্ষণে তাহার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন করিয়া দিতেছে? এতোদিন সে হৃদয়ের ভাব রাশিকে ভাষা দিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াই পরিতৃপ্ত ছিল, আজ আর তাহাতে তৃপ্তি পাইতেছে না কেন? কি এক অতৃপ্তি যেন ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় মন অধিকার করিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছে! সে সাহিত্য-সাধনায় মনোযোগী হইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার হৃদয় কাহার চরণ-ধ্বনি শুনিবার প্রত্যাশায় যেন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে! সে একদিন মনে মনে সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশের সেবা করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। যে জনসাধারণ অত্যাচার উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা সহ্য করে, কিন্তু মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারে না, বঞ্চিত হইয়াও প্রতিকার করিবার ভরসা খুঁজিয়া পায় না, প্রতিকুল অবস্থায় পড়িয়া যাহাদের আশা আকাংক্ষা সাধনা কোন দিন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিল না, তাহাদের বুকের ভাষাকে বাণীরূপ দিবার সাধনায় সে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিল। আজ এক অভূতপূর্ব চিন্তা, নূতন অভাব-বোধ তাহার সেই সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইতেছে! যে তরুণীটি সিক্ত-বসনে এক ঝড়ের দিনে আসিয়া তাহার বাণী-সাধনার প্রশস্তি গাহিয়া গিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া তাহার অপূর্ব সুন্দর মুখখানিই বারবার মনে পড়িয়া যাইতেছে। এই একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তাকে সে সযত্নে পরিহার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিয়া উঠিল না।

পশ্চিম গগনে আবির ছড়াইয়া সূর্য যখন অস্ত যাইতেছে, তখন সে বিফল প্রযত্ন বাণী-সাধনা আপাতত বন্ধ রাখিয়া খোলা মাঠের দিকে বাহির হইয়া পড়িল। মাঠের মাঝখান দিয়া ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা রেল স্টেশনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে চাষী ও ব্যবসায়ীরা আলু ও ধানের গাড়ী লইয়া স্টেশনের দিকে চলিয়াছে। দূর গ্রামের কোন মোকামে অথবা সহরে তাহারা এগুলি বিক্রয় করিবে।

রাখাল বালকেরা চারণ শেষ করিয়া গোরু, বাছুর, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি লইয়া ঘর্মাক্ত রক্তিম মুখে ঘরে ফিরিতেছে। তাহাদের মুখে বিচিত্র উল্লাস-ধ্বনি। মাঠের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ শাখা-বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তার তলায় বেদীর মতো উঁচু মাটির ঢিবি। বেড়াইতে বেড়াইতে স্নীতিকুমার সেইখানে গিয়া উপবেশন করিল। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ বাতাসে তাহার শরীর মন জুড়াইয়া গেল। দূরের ধূসর দিগন্ত রেখা ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া স্নীতিকুমার ভাবিতেছিল, দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর মাস, মাসের পর বৎসর—এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে জীবনের পরিধি কমিয়া আসিতেছে; কিন্তু পৃথিবীতে আসিয়া কি কাজ সে করিল? মানব সভ্যতার ভাণ্ডারে তাহার কতটুকু দান জমা হইয়া থাকিবে? ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা যখন হিসাব-নিকাশ করিতে বসিবে, তখন মহাকালের ইতিহাসে তাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইবে কি? তাহার কত সাধ, কত আকাংক্ষা, কত ভাব মনঃসমুদ্রে ক্ষণিকের লহরী তুলিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। এইরূপ নানা দার্শনিক চিন্তায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। গত কয়েক দিন ধরিয়া যে মুখখানি তাহার মনের আসন জুড়িয়া ছিল, ঐই সব দার্শনিক চিন্তার কাছে তাহাও যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। কতক্ষণ যে তাহার এইভাবে কাটিত বলা যায় না, পিছনে একান্ত নিকটে কাহার পদশব্দ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে মুখ চেনা যাইতেছিল না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল: কে এখানে?

আগন্তুক বলিল: আমি আবদুল, মাষ্টারমশাই। আপনি এখানে বসে আছেন? আমি আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি?

বছর দশেক আগে আবদুল স্কুলে পড়িবার সময় স্নীতিকুমার কিছুদিন তাহার মাষ্টারী করিয়াছিল। গরীবের ছেলে বলিয়া তাহার নিকট

হইতে মাহিনা-পত্র কিছুই লয় নাই। আবদুল এজন্য এখনও তাহাকে সমীহ করিয়া চলে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

দুই একজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সন্তানকেও সে সেই সময়ে বিনা বেতনে পড়াইয়াছিল ; কিন্তু সেই সব ছাত্রেরা এখন তাহাকে সমীহ করা ত দূরের কথা—তাহার সামনে বিড়ি সিগারেট খাইতেও ইতস্তত করে না। তাহারা সম্ভবত ষোড়ষ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চাণক্যের মতে সাবালক হইয়া গিয়াছে।

সুনীতিকুমার জিজ্ঞাসা করিল : আমার কাছে তোমার কিছু দরকার আছে নাকি আবদুল ?

—আপনি আমার নাইট-স্কুল দেখতে যাবেন বলেছিলেন, আজ চলুন না।

সুনীতিকুমার খুসী হইয়া বলিল : বেশ চলো, আজই যাবো।

অন্ধকারে পদচিহ্নহীন মেঠো পথ বাহিয়া উভয়ে অগ্রসর হইল। আকাশের গায়ে নক্ষত্রগুলি হীরকখণ্ডের মতো জ্বলিতেছে, কোনোটা স্তিমিত-জ্যোতি, কোনোটা বেশ উজ্জ্বল। দূর বিসর্পিত শূন্য পথের পানে চাহিলে সেটাকে কতোই না রহস্যমণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। যাহা নাগালের বাহিরে, তাহাই যেন রহস্যাবৃত! ঈশ্বর পৃথিবীর মানুষের কাছে আয়ত্তাধীন নন বলিয়া তিনি চির রহস্যময়! কাহারও দৃষ্টিতে তিনি মানুষের সুখ-দুঃখ এবং ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, কেহবা কল্পনার চোখে তাঁহাকে কঠোর বিচারকরূপে দেখিয়া সন্ত্রস্ত থাকে।

৩

চলিতে চলিতে তাহারা ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের ধূলি ধূসরিত পথের উপর আসিয়া পড়িল। দুই লহর রাস্তা, একপাশে মানুষের যাতায়াতের পথ। একবার দুর্ভিক্ষের সময় বেকার শ্রমজীবিদের দিয়া তাহাতে মাটি

ধরান হইয়াছিল ; তাহার পর কয়েকবৎসর কাটিয়া গিয়াছে, আর তাহাতে মাটি পড়ে নাই। রাস্তার আশ-পাশের বিভিন্ন গ্রামের লোকেরা পথটিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় মনে করিলেও বোর্ডের কর্তারা কিন্তু এ বিষয়ে অদ্ভুত রকমের উদাসীন। বর্ষার দিনে যাহারা এই পথ দিয়া যাতায়াত করে অথবা গরু মহিষের গাড়ী লইয়া যায়, তাহাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা মাঝে মাঝে তাহাদিগকে কর্তাদের নিকট দরখাস্ত পাঠাইতে উদ্বুদ্ধ করিলেও কর্তারা দরিদ্র নিরুপায় ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন জনগণের কাতর আবেদনে কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করেন না। জনসাধারণের ভোটাধিকার বলে পদাধিকারী জনতার সুখ-সুবিধার প্রতি উদাসীন এই সকল সহরবাসী কর্মকর্তাদের যাতায়াতের পথ ত কোন দিন বিঘ্ন সংকুল হইয়া ওঠে না!

ক্রমে তাহারা আবদুলদের গ্রামে আসিয়া পৌছিল। আবদুলের প্রগতিশীল মনের পরিচয় ইতিমধ্যে গ্রামবাসীগণ পাইয়াছে। তাহার হিন্দু-মুসলমান মিলনের আগ্রহ, পর্দাপ্রথা নিবারণের আকাংক্ষা, বালক বালিকা ও বয়স্ক নরনারী নির্বিশেষে শিক্ষাদানের প্রতি ঔৎসুক্য— তাহার স্বগ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের কাহারও অবিদিত নাই। তাহার ধারণা,—হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের কয়েকজন স্বার্থবাদী ব্যক্তির কাজের ফলেই মিলনের শুভলগ্ন ক্রমাগত পিছাইয়া যাইতেছে। হিন্দু ও মুসলমানের অদূরদর্শিতা এই দেশে পরাধীনতারূপ অভিশাপ ডাকিয়া আনিয়াছে ; উভয় পক্ষের সংকীর্ণ স্বার্থবোধ, দূরদৃষ্টির অভাব এই সকল দুঃখের মূল পরাধীনতাকে কায়েম করিয়া রাখিয়াছে। পরস্পরের হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সহিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের, মুসলমানের সহিত হিন্দুর, ধনীর সহিত দরিদ্রের যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, সর্বশ্রেণীর সকল নরনারীর প্রকৃত শিক্ষালাভ ছাড়া সেই ব্যবধান দূর হইতে পারে না। শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসে শিক্ষা প্রসারের

যে পথ নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকেই সে প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে করে। তাহার নৈশ-বিদ্যালয় এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

আবদুলের বাল-বিধবা দিদি, আবদুল ও তাহার স্ত্রী—এই তিনজনকে লইয়াই তাহার সংসার। কয়েক বিঘা ধানের ও আলুর জমি, একটি বাঁশঝাড় এবং খিড়কিতে একটি মাঝারি রকমের পুকুর, দুইটি বলদ, একটি সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী ও চাষের সরঞ্জাম—ইহাই তাহার সম্পত্তি। ঠিকা কৃষাণ লইয়া জমিগুলি সে নিজে চাষ-আবাদ করে। পুকুরে মাছ তৈরী করে, তাহার কতক বিক্রী হয়, কতক খাওয়া চলে। সর্বদা ব্যবহার হয় বলিয়া পুকুরটার মাছ বাড়েও মন্দ নয়।

সংসারের তিনটি মানুষ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও কর্মঠ, তাই আবদুলের সংসারে ব্যক্তিমন হইতে উদ্ভূত কোন অশান্তির নাম গন্ধ নাই।

আবদুলের বাড়ীর সংলগ্ন দলিজে নৈশ-বিদ্যালয় বসে। স্বগ্রামের এবং নিকটবর্তী পাশের কয়েকখানি গ্রামের বিভিন্ন বয়সের পঞ্চাশ ষাট জন ছাত্র-ছাত্রী এখানে বিদ্যাভ্যাস করে। ছাত্রী শুধু তাহার স্বগ্রাম হইতেই আসে, এবং তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

বিদ্যালয়ের সন্নিকটবর্তী হইয়া সুনীতিকুমার দেখিল, সকলেই অধ্যয়নে রত রহিয়াছে। পাঠশালা হইতে অর্থহীন কোন গোলমাল উঠিয়া দূরবর্তী মানুষের বিশ্রম্ভালাপের বিঘ্ন উৎপাদন করে নাই। ভূতপূর্ব ছাত্র আবদুলের এইরূপ কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া সুনীতিকুমার অত্যন্ত প্রীত হইল। সুনীতিকুমার আবদুলের প্রদত্ত আসনে বসিয়া সকলকে বসিতে ইংগিত করিল।

আবদুল বাড়ীর ভিতরে গিয়া সুনীতিকুমারের আগমন সংবাদ দিয়া আসিয়া একে একে সকলের পাঠ গ্রহণ করিতে ও নূতন পাঠ দিতে

লাগিল। এসব ব্যাপার মিটিয়া গেলে সে ছাত্রছাত্রীগণকে উদ্দেশ করিয়া নানা বিষয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিল। অতঃপর সুনীতিকুমারকেও কিছু বলিতে অনুরোধ করিল। প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ আবদুলের শিক্ষাদান পদ্ধতি সুনীতিকুমারকে মুগ্ধ করিল।

সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্য আবদুল সসম্মানে মাষ্টার মশাইকে আহ্বান করিল।

সুনীতিকুমার বিস্মিত হইয়া এই আমন্ত্রণ অস্বীকার করিল।

আবদুল চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল: আপনি বাড়ীর ভেতরে যাবেন না মাষ্টার মশাই? ওরা যে আপনার জন্যে অপেক্ষা করচে? না, সে হবে না, চলুন।

আবদুলের স্ত্রী আসমানতারা ও তাহার দিদি যোবেদা বোধকরি বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হইবার পর নিকটেই কোথাও অবস্থান করিতেছিল; তাহারা বাহির হইয়া আসিল।

আসমানতারা হিন্দুপ্রথায় সুনীতিকুমারের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিল।

সুনীতিকুমার ব্যস্ত বিব্রত হইয়া বলিল: থাক মা থাক, পায়ে হাত দিতে হয় না। চলো, আমি ভেতরে যাচ্চি।

আবদুলরা সকলে আনন্দিত হইয়া অগ্রসর হইল। সুনীতিকুমারের নিকট একটা প্লেটে করিয়া কয়েকগুচ্ছ আঙ্গুর ও দুইটা কমলালেবু ধরিয়া দিয়া আসমানতারা তাহাকে খাইতে অনুরোধ করিল।

—এসব কেন যোগাড় করেচ মা? একটু চা খাওয়ালেই ত পারতে?

—খাবেন আপনি চা মাষ্টার মশাই?—বলিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া আসমানতারা লঘু পদক্ষেপে চা প্রস্তুত করিতে চলিয়া গেল।

—বৌমা বড় চমৎকার মেয়ে! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও আবদুল!

আবদুলের দিদি যোবেদা বলিল ঃ তাই বলুন মাষ্টার মশাই, ওদের সুখেই আমার সুখ।

হিন্দু ঘরের মেয়ের মতোই মেয়েটি। তেমনি স্নেহপ্রবণা, তেমনি লীলা-চঞ্চলা! চোখে মুখে গতি-ভংগিতে খুসী যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

ইহাদের দেখিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদই কল্পনা করা যায় না। মানুষ হিসাবে সবাই এক। হিন্দুদের মতো ইহারাও আনন্দে অধীর হয়, শোকে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। হিন্দুদের মতোই জীবনে অভ্যুদয় কামনা করে ইহারা, পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে ইহারাও চায়। ইহাদের মধ্যে নিষ্ঠুর ও ক্রূর প্রকৃতির আছে অনেকে, যাহারা অকারণ মানুষকে বিব্রত করে; মামলা মোকর্দমা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াই যাহাদের পেশা। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেই কি এরূপ নিষ্ঠুর মামলাবাজ মিথ্যা-সাক্ষ্য-দানকারীর অভাব আছে? তবে আবদুলের হিন্দু-মুসলমান মিলনের স্বপ্ন একদিন সফল হইবে না কেন? হিংসা-বিদ্বেষ বিসর্জন দিয়া কেন তাহারা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া সদ্ভাবে জীবন কাটাইতে পারিবে না? যাহারা এই মিলন বিশ্বাস করে না, ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের কথার অর্থ সে ভাবিয়া পায় না। যাহারা অবিশ্বাস করে করুক, সুনীতিকুমার পারিবে না। আবদুলদের সংগে কোনখানে তফাৎ আছে সুনীতিদের?

পরিচ্ছন্ন নূতন পেয়ালা-পিরিচে করিয়া ধূমায়িত চা লইয়া আসিল আসমানতারা। খুসীতে চোখ-মুখ তাহার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। চরম সার্থকতায় বুকখানি ভরিয়া গিয়াছে যেন! আবেগ-উচ্ছ্বসিত সস্নেহ-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল সুনীতিকুমার। মেয়েটিকে কাছে বসাইয়া ছোট বোনটির মতো, তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছিল তাহার! এতো অবিমিশ্র আনন্দ বোধ করি আর কখনও তাহার হয় নাই!…

চায়ে চুমুক দিয়া দেখিল, চমৎকার সৌগন্ধযুক্ত সুস্বাদু চা তৈরী করিয়াছে মেয়েটী! অথচ ইহারা কেহই চা খায় না! বলিল, বস মা, এবার বস তুমি এখানে।

আসমানতারা বসিয়া বলিল: চা খুব খারাপ হয়েচে মাষ্টার মশাই?

—খারাপ? মোটেই না। খুব চমৎকার চা হয়েচে মা, সত্যি বলচি!

চা পানের সহিত আলাপ-আলোচনায় আরও কিছুক্ষণ কাটাইয়া সুনীতিকুমার বিদায় গ্রহণ করিল।

প্রকৃতি রহস্যময়ী। দিবালোকে বিশ্ব-জীবনের কর্ম-কোলাহলের মধ্যে তাহার এই রহস্যময় রূপ ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় না। রাত্রির মগ্নতার মধ্যে চিরযৌবনা প্রকৃতির আপনাকে লইয়া খেলা চলিতে থাকে। তখন সে আপনাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, তাহার রূপের মাধুর্য ও ভয়ংকরতা এককালে ফুটিয়া ওঠে। সাহসী দ্রষ্টা সেই রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়! রহস্যময়ী প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ দর্শনের সৌভাগ্য সকলের হয় না। সুনীতিকুমার বিকশিত যৌবনা প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হইয়া ধীরপদে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

৪

সুনীতিকুমার যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। তাহার দিদি প্রদীপের আলোয় কি একখানা বাংলা বই পড়িতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল: এতো রাত করে এলি, কোথায় ছিলি?

আজ আবদুলের নাইট-স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম দিদি, স্কুলটাকে বেশ গড়ে তুলেচে। যেভাবে স্কুল চালাচ্চে, দেখে আমার মনে হয়, নিষ্ঠার সংগে চালিয়ে গেলে ঐ স্কুলের দ্বারাতেই দেশের অনেক উপকার হবে। আবদুল যে এতো বড় কাজ করচে, তা আমার ধারণা ছিল না!

আবদুলের দিদিকে আর তার স্ত্রীকে দেখলাম, তাঁরাও চমৎকার মানুষ !

তাঁরা তোর সংগে কথা বললেন নাকি ?

বললেন তো। আমি অবশ্য তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। গ্রামের মধ্যে এতোটা সংস্কার-মুক্তির ভাব বড় দেখা যায় না। সময়টা আমার বড আনন্দেই কেটেচে !

দিদি অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত ভ্রাতার কথা শুনিয়া যাইতেছিল। বলিল : আমার সংগে একদিন দেখা করিয়ে দিতে পারিস না সুনীতি ? আমার বড় দেখতে ইচ্ছে হয়।

বলব তোমার কথা আবদুলকে।

তুই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার পরই একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, অনেকক্ষণ তোর জন্যে অপেক্ষা করলেন। আমি চা করে দিলাম। মীরা-দেবীর দাদা তিনি। কাল বিকালে আবার আসবেন বলে গেচেন। তোর লাইব্রেরীতে একখানা চিঠিও রেখে গেচেন তোর জন্যে।

সুনীতিকুমার ব্যস্ত হইয়া চিঠির খোঁজে চলিয়া গেল। তাহার যেন আর দেরি সহিতে ছিল না।

বই কাগজ চিঠিপত্র লেখাপড়া লইয়া তাহার পাগলামির অন্ত ছিল না, দিদি এজন্য অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিত। আজও তাহার এই আগ্রহ দেখিয়া সে বিস্মিত হইল না। সে তাহার রাত্রির আহারের আয়োজন করিতে লাগিল।

কি করিয়া সংসার চলিতেছে, সুনীতিকুমার কোনদিন তাহা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামায় না। পৈতৃক জমিজমার তত্ত্বাবধান তাহার দিদিই করিয়া থাকে। বাড়ীতে একজন বাঁধা মাহিনার চাকর আছে, তাহার

সাহায্যেই দিদি সব কাজ চালাইয়া লয়। দিদির সাংসারিক বুদ্ধি ও নিপুণতার কাছে সুনীতিকুমার শিশুতুল্য।

এই অসংসারী সাহিত্য-পাগল ভাইটির বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিবার জন্য দিদি ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এ পর্যন্ত তেমন উপযুক্ত মেয়ে খুঁজিয়া পায় নাই। উপযুক্ত স্বজাতীয়া পাত্রীর একান্ত অভাব। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতির. স্বশ্রেণীর বিভিন্ন বিভাগে বিবাহের প্রচলন সে মনে-প্রাণে কামনা করে। অসবর্ণ বিবাহকেও সে খুব আপত্তিকর বলিয়া মনে করে না। যুগ পরিবর্তনের সহিত প্রথারও যে প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন আবশ্যক—হিন্দু সমাজ-পতিগণ তাহা বিবেচনা করিলে জীবন-যাত্রা অনেক সহজ হইয়া যায়। অসবর্ণ বিবাহ যদিও অনেক স্থলে হইতেছে, কিন্তু সমাজ তাহাকে যথা-যোগ্য মর্যাদার সহিত স্বীকার করিয়া লইতেছে না। আইন করিয়া সমাজ-মন বদলানো যায় না, বিধবা-বিবাহের বিধিবদ্ধ-আইন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! শাস্ত্রীয়-অনুশাসনের মর্মবাণী যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবার মতো উদার মনোবৃত্তি ও সূক্ষ্ম-দর্শিতার একান্ত অভাব। এই সব ভাবিয়া সুনীতিকুমারের দিদি সুমনা অনেক সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

সুনীতিকুমার লাইব্রেরীতে গিয়া দেখিল, টেবিলের উপর পেপার-ওয়েট চাপা একটি ক্ষুদ্র চিঠি রহিয়াছে। সে খুলিয়া পড়িল:

প্রিয় সুনীতি বাবু,

আমার বোন মীরা আপনার লেখার অন্ধ-ভক্ত, সম্প্রতি সে আপনার সংগে পরিচয়ের সুযোগও লাভ করিয়াছে। তাহার মুখে আপনার প্রশংসা ধরে না। আমি যদিও আপনার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করি নাই, কিন্তু আপনার রচনার সহিত একেবারে অপরিচিত নহি। মা এবং মীরার বৌদিও আপনার সংগে পরিচিত হইতে কম

উৎসুক নহেন। আমি আগামীকাল বিকালে আসিব। আমার সংগে আপনি আমাদের বাড়ীতে গেলে আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইব! আমার প্রীতি-নমস্কার নিন। ইতি

বিনীত

শ্রীপ্রমথনাথ গুপ্ত

চিঠি পড়িয়া সে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইল! এই নিমন্ত্রণ সে গ্রহণ করিবে কিনা, ভাবিতে লাগিল। যে সৌভাগ্যের প্রত্যাশা সম্ভবত তাহার মনের নির্জ্ঞান-স্তরে ছিল, সেই সৌভাগ্য আজ মনোরম মূর্তি ধরিয়া তাহার সামনে উপস্থিত হইয়াছে! ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তাহার বেদনাতুর হৃদয় চিরকালের জন্য চরমতম বেদনায় মুহ্যমান হইয়া থাকিবে! কিন্তু কেন তাহার এই সংকোচ? আপন হৃদয় তন্ন-তন্ন করিয়া সে এই সংকোচের কারণ অনুসন্ধান করিল। জানিয়া স্তম্ভিত হইল যে, মাত্র একদিনের দেখায় ও আলাপ-আলোচনায় সে মীরাদেবীকে গভীরভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে! 'মীরা' এই নামটি হইতে যেন সুধা ক্ষরিত হইতেছে! কতবার কতভাবে সে মীরার নাম মনে মনে উচ্চারণ করে, নূতন অনুভূতিতে তাহার হৃদয়-মন ভরিয়া যায়! এমন বেদনাময় আনন্দের অনুভূতি তাহার জীবনে আর কখনও আসে নাই। প্রেম চিরদিনই প্রেমিক-প্রেমিকাকে কাঁদায়; প্রেমের আনন্দও যেন কান্নামাখানো!

কিন্তু মীরা? সেও কি তাহাকে এমনি করিয়া ভালবাসিয়াছে? তাহার কথা কি সে এমনি করিয়াই ভাবে? তাহার হৃদয়ও কি সুনীতি-কুমারের জন্য বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছে? না হইলে দাদাকে দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবে কেন?

কিন্তু এমনও ত হইতে পারে যে, ভদ্রতা করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ

করিয়াছে? এখানে তেমন আলাপ-আলোচনা করিবার লোক নাই বলিয়া তাহাকে অবসর বিনোদনের সংগী হিসাবেও নিমন্ত্রণ করিতে পারে ত? কলিকাতার মেয়ে সে, কত মেলামেশার সুযোগ পাইয়াছে এই বয়সেই! সে কি দুঃখে একজন সামান্য গ্রাম্য সাহিত্যিককে ভালবাসিতে যাইবে? সে কি বামন হইয়া আকাশের চাঁদ ধরিবার আশা পোষণ করিতেছে না?…তাহার অন্তস্তল ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল!

সুনীতিকুমারের দেরি দেখিয়া তাহার দিদি তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিতে আসিয়া দেখিল, সে চিঠিখানি হাতে করিয়া কি যেন নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিতেছে। সুমনার পায়ের শব্দেও সে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল না। সে ডাকিল: সুনীতি!

সুনীতিকুমার চমকিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল: ওঃ তুমি?

সুমনা ভাবিল, চিঠিতে এমন কি কথা আছে, যাহাতে সুনীতিকে এতোটা বিচলিত করিয়াছে? জিজ্ঞাসা করিল: ওতে কি লেখা আছে ভাই, আমাকে বলা চলবে কি?

সুমনা অপরের এমন কি সহোদর-ভ্রাতার চিঠিপত্রের প্রতিও কোনোদিন কৌতূহলী নহে; বিনা অনুমতিতে অপরের চিঠি পড়াটাকে সে কোনোদিন শোভন ও সুরুচি-সংগত মনে করে না। কিন্তু ভাইকে চিন্তা-ভারাক্রান্ত দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না।

সুনীতিকুমার কোন উত্তর না দিয়া তাহার হাতে চিঠিখানি তুলিয়া দিল।

সে চিঠিখানা পড়িয়া বুঝিতে পারিল না যে, ইহাতে ভাবিবার এমন কি আছে। বলিল: এঁরা বৈদ্য? আমি ভেবেছিলাম ব্রাহ্মণ।

যাহাকে তাহাকে স্বজাতি ও স্বঘর মনে করিয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিবার অভ্যাস দিদির আছে। ইহা সুনীতিকুমার জানিত।

সে এবারেও কোনো উত্তর দিল না। সবর্ণ-অসবর্ণের প্রশ্ন লইয়া সে কোনোদিনই মাথা ঘামায় না। সে জানে প্রাণের-মিলনই প্রকৃত মিলন !

সুমনা বলিল : নিমন্ত্রণ করেচেন, যাবে ; তার জন্যে এতো ভাববার কি আছে ?

—তাঁরা কলকাতার সভ্য-সমাজের মানুষ এবং ধনী। আমাদের কি উচিত তাঁদের-সংগে মেলামেশা করা ? যদি শেষ পর্যন্ত তাল রেখে চলতে না পারি-?

সুমনা বুঝিতে পারিল যে, ইহা সুনীতির মনের কথা নহে, অন্যকথা বলিয়া তাহাকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। সে যেন কিছুই বোঝে নাই, এমনিভাবে পূর্ব প্রশ্নের উত্তর দিল : তুমি তো নিজের থেকে মেলা-মেশার চেষ্টা করচ না ? তাঁরা ত আমাদের অবস্থা দেখেই নিমন্ত্রণ করেচেন, এতে আর দোষের কথা কি ?

—তাহলে আমায় যেতে বলচ ?

—নিশ্চয়ই, না গেলে ভাল দেখায় ? এতো করে আগ্রহ দেখিয়েচেন ?

—বেশ তাই হবে, চলো এখন খাওয়া-দাওয়া করিগে।

পরদিন বিকালে সুনীতিকুমার তাহার লাইব্রেরীতে বসিয়া নারী ও পুরুষের চিরন্তন সম্পর্ক ও অধিকার লইয়া একটা প্রবন্ধ রচনা করিতেছিল। 'ভারতভূমি' পত্রিকায় প্রবন্ধটা পাঠাইতে হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষিগণ এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংগৃহীত পুস্তক-পত্রিকা ও 'নোটে'র খাতা উল্টাইয়া সেগুলি মাঝে মাঝে সে দেখিতেছিল। নারীকে সে কোনোদিন ছোট করিয়া দেখিতে পারিল না। সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির সৌধ নির্মাণে নারীর দান পুরুষের চেয়ে কম নহে। নারীর স্নেহে, প্রেমে, শ্রদ্ধায়, মাধুর্যে, পুরুষের অন্তর

সঞ্জীবিত থাকে। পুরুষ কর্মী, কিন্তু নারী না থাকিলে পুরুষের কর্মপ্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করিত না। পুরুষের মরুময় বক্ষে নারী মরূদ্যান তুল্য !

পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর বয়সের একজন ভদ্রলোক আসিয়া হাসিমুখে নমস্কার করিলেন।

স্থনীতিকুমারও উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে তাঁহাকে নমস্কার করিল এবং চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিল।

জিজ্ঞাসা করিল : আপনি প্রমথ বাবু ?

আগন্তুক ভদ্রলোক হাসিমুখে বলিলেন : আজ্ঞে হাঁ, আপনি নিশ্চয়ই স্থনীতিবাবু ?

মাথা দুলাইয়া সে স্বীকার করিল।

প্রমথবাবু বলিলেন : আমি এমন সময় এসে আপনার কাজের ক্ষতি করলাম বোধহয়। কারণ ওসব ভাব রাজ্যের ব্যাপার কিনা, আমরা সাধারণ মানুষ, সাহিত্যিকদের সৃষ্টি-প্রতিভাকে যথোচিত মর্যাদা দিতে পারিনে ত ? মনে করি সংসারের আর পাঁচটা কাজের মতো সাহিত্য সৃষ্টিও একটা সাধারণ কাজ বুঝি।

স্থনীতিকুমার অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল : দেখুন আমাকে অমন করে বলবেন না ; আমি একজন সামান্য সাহিত্য-সেবী মাত্র।

—আপনি সামান্য লোক ! বেশ বেশ ! আপনি কি আর নিজের মুখে স্বীকার করবেন যে, আপনি একজন অসামান্য লোক ? বিনয় বলে একটা কথা আছে ত ?

—না দেখুন, আমি সত্যিই বলচি। আমার যোগ্যতা কতখানি, সেত আমার অজানা নেই ?

—কিচ্ছু জানেন না আপনি, হাতী কি নিজের শরীর দেখতে পায় ? কস্তুরী মৃগ কি নিজের গন্ধ বুঝতে পারে ?

সুনীতিকুমার কুণ্ঠিতহাস্যে বলিল: আপনার সংগে সত্যিই পারবার যো নেই।

কিছুক্ষণ পরে বৈকালিক জলযোগ ও চা পান করিয়া উভয়ে বাহির হইলেন। মিনিট পনের হাঁটিয়াই প্রমথবাবুর বাসা-বাড়ী পাওয়া গেল।

তখন পশ্চিম গগনে সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে! বিভিন্ন দিক হইতে পাখীদের কলকাকলী শোনা যাইতেছে।

পূবের ছায়া-স্নিগ্ধ খোলা বারান্দায় বসিয়া প্রমথবাবুর মা, মীরা ও তাঁহার স্ত্রী বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। মীরা উৎফুল্ল হইয়া কলকণ্ঠে আহ্বান করিল: আসুন, আসুন, সুনীতিবাবু, আমরা আপনার কথাই বলছিলাম, ভাবছিলাম আপনি হয়ত আসবেন না। কত যে সুখী হয়েচি আমরা আপনি আসাতে, তা জানাতে পারি না। ইনি আমার মা, আর ইনি আমার বৌদি সন্ধ্যাতারা।

পরস্পরের নমস্কার বিনিময় হইল।

সন্ধ্যা বলিলেন: আপনার বয়স এতো কম সুনীতিবাবু? আমি আপনার লেখা পড়ে ভেবেছিলাম, কতো বয়সই না জানি আপনার হয়েচে!

প্রমথবাবু বলিলেন: কি ভেবেছিলে সন্ধ্যা, দীর্ঘদেহ পক্ক কেশ আরক্ত লোচন?

সকলের উচ্চহাসির রোল উঠিল। মীরা বলিল: সুনীতিবাবু, কবিতার লাইনটা কিন্তু দাদার!

সুনীতিকুমার স্মিতমুখে বলিল: আপনারা ভাইবোনেই কবি দেখচি, আমি শুধু আপনাকেই জানতাম?

প্রমথবাবু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন: না না সুনীতিবাবু, আমি কবি

নই। তবে একটু আধটু কবিতা আওড়াতে না শিখলে কবি-বোনের কাছে খাতির পাওয়া যায় না কিনা।

হ্যাঁ দাদা, কবিতা আওড়াতে না পারলে আমি তোমার খাতির করি না? আচ্ছা মিথ্যুক ত তুমি। ভদ্রলোকের সামনে শুধু শুধু আমার নিন্দে করা!

প্রমথবাবু বলিলেন: একটা বেফাঁস কথা বলে কি বিপদেই পড়লাম স্নীতিবাবু?

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

স্নীতিকুমার এরূপ পরিবারের সহিত মিশিবার সুযোগ কখনও পায় নাই। ইঁহাদের সরলতা মাখানো মুখ, পবিত্র সুন্দর হাসি, সহজ রহস্যালাপ দেখিয়া তাহার মনের মেঘ অনেকখানি কাটিয়া গেল। কি চমৎকার আনন্দভরা জীবন! বিষাদ মাখানো গ্রাম্যজীবনের কলহ কুশ্রীতার সহিত ইঁহাদের স্বাস্থ্য-শ্রীভরা সদা হাস্যময় স্বচ্ছন্দ জীবনের তুলনা না করিয়া সে পারিল না।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো আবদুলের কথাটাও তাহার মনে পড়িয়া গেল। সত্যই আবদুলরা ভাল। ইহারা কেহই সহরের নয়। তথাপি পল্লী-জীবনের মালিন্য ইহাদিগকে স্পর্শ করে নাই।

আজ মীরা নূতন সাজে সাজিয়াছে। খদ্দরের সাড়ী, ব্লাউজ এবং সামান্য দুই চারিখানি গহনা পরিয়া অপূর্ব সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে সে। সেদিন কিন্তু তাহাদের বাড়ীতে খদ্দর পরিয়া যায় নাই সে; আরও বেশি অলংকারও যেন তাহার গায়ে ছিল। তথাপি এই পোষাকেই যেন বেশি মানাইয়াছে তাহাকে। এই পোষাকেই যেন সে আরও নিকট, আরও বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। এই পোষাকে সজ্জিত হইয়া সে কি লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারীর শত রকম দুঃখ-বেদনা অভাব-অভিযোগের কথা-চিন্তা করে অন্তর দিয়া? নাকি এ এক ধরণের খেয়াল?

এক রকমের বিলাস? এই হাসি-খুসী উচ্ছ্বাসের মধ্যে কি দরিদ্রের জন্য, বঞ্চিতদের জন্য বেদনা বোধ কোথাও আত্মগোপন করিয়া আছে? প্রাচুর্যের মধ্যে কি অভাবের বেদনা-বোধ সম্ভব?

তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া মীরা বলিল, কি ভাবচেন বলুন ত?

—কিছু না, আপনাকে দেখচি।

—আমাকে? বলিয়াই মীরা লজ্জিত হইয়া মাথা নিচু করিল। সহসা যেন কোন উত্তর দিতে পারিল না। সন্ধ্যাতারা তাহার পানে চাহিয়া বুঝিল, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে মীরা! মুখরা মেয়েটি সহসা যেন কথা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তাহাকে লজ্জার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যেন সে বলিল, তোমাকে না, তোমার এই অদ্ভুত পোষাকটাকে। এটা ত তোমার খেয়াল একটা।

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইল মীরা। বৌদির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। দারুণ লজ্জার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে সন্ধ্যাতারা তাহাকে। বলিল, কেন খদ্দর পরা ত ভাল বৌদি? খেয়াল হতে যাবে কেন এটা আমার? সুতো কাটা থেকে বোনা পর্যন্ত খাদি তৈরীর কাজে যারা আত্মনিয়োগ করেচে, তারা আমাদের এই গরীব দেশের ভাই-বোন। খদ্দর পরলে তাদের সংগে একাত্মতা অনুভব করা যায়। তাই খদ্দর পরি। আর কিছু ত করতে পারি না তাদের জন্যে?

একে ত খদ্দর পরিয়া মীরাকে চমৎকার দেখাইতেছিল, ইহার উপর এই কথাগুলি অত্যন্ত ভালো লাগিল সুনীতিকুমারের। যদিও আগের কথাগুলা বলিয়া ফেলিয়া সেও কম লজ্জা অনুভব করে নাই। মুখ তুলিয়া মীরার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি কি এমনি করে ভাবেন নাকি গরীবদের কথা?

মীরা বলিল, ভাবি, তবে অনুগ্রহের ভাবে নয়; সত্যিই তাদের জন্যে আমি দুঃখ বোধ করি। তাদের বঞ্চিত করেই আমাদের প্রাচুর্য, শিক্ষা সভ্যতা, বিলাস-ব্যসন। নিতান্ত নিরীহ তারা, ভাগ্যের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেচে নিরুপায় ভাবে; এইসব বঞ্চনার কথা ভাবতেও পারে না তারা, ভাবতে পারলে নিশ্চয়ই দাবী উপস্থিত করত। এমন করে সামান্য অনুগ্রহ পেলে কৃতজ্ঞতা বোধ করতো না আমাদের কাছে। চিরকাল বঞ্চনাকেই তারা ভাগ্যলিপি বলে মেনে এসেচে।

এই ত? এমনি করিয়াই ত ভাবে সুনীতিকুমার? এতো মনগড়া কথা নয়? বুকের বীণায় অহরহ যে সুর বাজে মীরার, তাহাই ত ভাষায় প্রকাশ করিতেছে সে? আবদুলও এমনি করিয়াই বঞ্চিতদের কথা ভাবে, মীরাও ভাবে। সত্যিই মানুষ সবাই এক ধরণের—যাহাদের মনুষ্যত্ব আছে। ইহাদের আর হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান নাই; ধনী, দরিদ্র, নারী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নাই। একই ভাবে চিন্তা করে ইহারা, একই ধরণের বেদনা-বোধ ইহাদের অন্তরে; একই জাতি ইহারা, বঞ্চিতদের চেতনা জাগাইবার, তাহাদের সত্যিকার মানুষ করিবার অনেক পরিকল্পনা আছে সুনীতিকুমারের। মীরাকে পাইলে আবদুলদের লইয়া অনেক কিছুই করিতে পারে সে। তাহার সহিত সেইসব বিষয় লইয়া পরামর্শ করিলে কেমন হয়?

হয়ত সেও তাহার সহিত আনন্দে যোগদান করিতে পারে। কিন্তু তাহার দাদা, মা, বৌদি—তাঁহারা কি অনুমতি দিবেন? মীরার বিবাহ ত দিতেই হইবে? কয়দিনই বা পাইবে তাহাকে? হয়ত কোনো-দিনই পাইবে না, সমাজ আছে ত? আজকাল অবশ্য সমাজ লইয়া লোকে বেশি মাথা ঘামায় না, তথাপি ইহার সূক্ষ্ম প্রভাব অনুভব করে সকলেই। মীরাকে যদি একান্ত আপনার করিয়া পাইত সে, তাহা হইলে হয়ত ইহা সম্ভব হইতেও পারিত! কিন্তু ইহা অসম্ভব স্বপ্নের

মতোই মনে হয়, কোনো দিনই হয়তো এ-স্বপ্ন সফল হইবে না। আর সে বলিতেও পারিবে না এমন কথা মীরাকে।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যাতারা চা ও জলখাবার আনিবার জন্য উঠিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, চুপ-চাপ বসিয়া আছে ইহারা। সন্ধ্যার স্বামী ঘরের মধ্যে উঠিয়া গিয়া আলমারি খুলিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কি একটা অনুসন্ধান করিতেছেন। মা মাঝে মাঝে ইহাদের পানে তাকাইতেছেন মাত্র। আবার খোলা মাঠের পানে যেন চাহিয়া দেখিতেছেন, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে গাঢ় অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে; কান পাতিয়া যেন শুনিতেছেন, সন্ধ্যাকালীন শাঁখের ক্রমিক শব্দ। সন্ধ্যাতারা চা ও জলখাবার খাইবার জন্য আলোকোজ্জ্বল গৃহের মধ্যে সকলকে আহ্বান করিলেন।

চায়ের সংগে সংগে নানা বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। প্রমথবাবু উজ্জ্বল মুখে একখানি চমৎকার বাঁধানো সোনার জলে নামলেখা খাতা আনিয়া স্নুনীতিকুমারকে দিয়া বলিলেন: পড়ে দেখবেন, সবই মীরার লেখা। বোনটিকে আমি মানুষ করেচি আমার ভাইয়ের মতো করে। তার যে স্বাধীন সত্তা আছে, তার মতামতের যে মূল্য আছে, ইচ্ছামতো জীবনের আদর্শ বেছে নেওয়ার অধিকার আছে, একথা আমি স্বীকার করি, মা এবং সন্ধ্যাও স্বীকার করেন। মীরা যদি ভুল করে, তার ফল মীরাই ভোগ করবে আর পাঁচজনের মতো, তা বলে ওকে আমরা তিরস্কার করবো না ওর ভুলের জন্যে! আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি এবং সমবেদনার অভাব কোনোদিনই হবে না! তবে ভাল পরামর্শ দিয়ে যাব চিরকাল।

আশায় আনন্দে উৎসাহে স্নুনীতিকুমারের বুক দুলিয়া উঠিল! এমনি সজীব মনই সে খুঁজিতেছিল। সমাজ-ব্যবস্থাকে বর্তমানের

উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে ইঁহারা অনেকখানি সাহায্য করিতে পারিবেন।

সংকোচ বশত সুনীতিকুমার ইঁহাদের সামনে কোন কথাই বলিতে পারিল না, সময় এবং সুযোগ মত আর একদিন সব কথা আলোচনা করিবে ঠিক করিয়া ইঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

সন্ধ্যাতারা বলিলেন: আবার আসবেন কিন্তু সুনীতিবাবু, আপনাকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দ লাভ করেচি! সন্ধ্যাটা বেশ ভালই কাটল!

মীরা সন্ধ্যাতারাকে গোপনে একটি মধুর চিমটি কাটিল।

৫

আবদুল আসমানতারাকে বলিল: আসমানি, মাষ্টার মশাইয়ের কথাত তুমি প্রায়ই বল, যাবে একদিন তাঁদের বাড়ীতে? অবশ্য দিদিও সংগে যাবেন? বলিয়া সে তাহার মুখের পানে চাহিল।

আসমানতারা তৎক্ষণাৎ সানন্দে রাজী হইয়া গেল। পরক্ষণে বলিল, কিন্তু মাষ্টার মশাই বিরক্ত হবেন না ত তাঁদের বাড়ীতে গেলে?

—বারে, তা বুঝি জান না? মাষ্টার মশাই যে তোমাকে আর দিদিকে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেচেন। তাঁর দিদির ত তোমাদের দেখবার জন্যে খুবই আগ্রহ। এর মধ্যে দিদি একদিন আমায় ডেকে তোমার খুব প্রশংসা করেচেন!

—মাষ্টার মশাই বোধ করি আমার কথা খুব বাড়িয়ে বলেচেন। না হলে আমায় না দেখেই দিদি এত প্রশংসা করবেন কেন?

—বাড়িয়ে ঠিক নয়, তোমাকে মাষ্টার মশাইয়ের খুব ভাল লেগেচে!

—আমারও মাষ্টার মশাইকে খুব ভাল লেগেচে! কী সুন্দর স্নেহ-ভরা কথাবার্তা তাঁর! ইচ্ছে হয়, সব সময় তাঁর কাছে থাকি, তাঁর সেবাযত্ন করি! কিন্তু মুসলমান যে আমরা, সে সৌভাগ্য ত করে

আসি নি! বলিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, মুখখানিও তাহার কেমন যেন ম্লান হইয়া গেল।

আবদুল প্রতিবাদ করিয়া বলিল, ও কথা ব'লো না, মুসলমান বলে তিনি তোমায় ঘৃণা করেন নি, এবং কারুকেই ঘৃণা করেন না। তবে দুর্বৃত্ত হলে তিনি খুবই ঘৃণা করেন। খাঁটি মানুষকে ভালবাসতে কিংবা শ্রদ্ধা করতে গিয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমান জাতের বিচার করেন না। তাঁর মহত্ত্বকে ছোট ক'রো না আসমান!

—না না, সে কি, কি ভুল করো বল ত? তাঁকে আমি খুব—খুব শ্রদ্ধা করি! নিজের দাদার চেয়েও তাঁকে আপন-জন মনে করি। বলিয়া মাষ্টার মশাইয়ের উদ্দেশ্যে যুক্ত কর কপালে ঠেকাইয়া হিন্দু প্রথায় শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

আবদুল এই সরলা স্নেহপুত্তলিকাকে বুকে টানিয়া লইয়া স্নেহ ও গর্ব ভরে চুম্বন করিল!

সন্ত্রস্ত হইয়া আসমানতারা বলিল, ছাড়ো ছাড়ো, এখনই কেউ দেখে ফেলবে! বলিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইল এবং খোলা দরজার পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

৬

বিকালের দিকে সুনীতিকুমার আসিল আবদুলদের বাড়ী। আজই তাহাদের সকলকে সে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চায়। দিদির বড় সাধ ইহাদের দেখিবে, কতদিন ভাইকে এজন্য তাগিদ দিয়াছে। তাই আজ সুনীতিকুমার সময় করিয়া ইহাদের লইতে আসিয়াছে। তাহার আগমন সংবাদে ইহাদের আনন্দের সীমা রহিল না, বেশ একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। তেমনি আগের দিনের মতোই আসমানতারা সুনীতি-কুমারের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিল। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল,

ভাল আছেন মাষ্টার মশাই ? আর আসেন নি যে আমাদের বাড়ীতে ? আমি রোজ পথের দিকে চেয়ে থাকি আপনার জন্যে। আমাদের কথা মনে ছিল না আপনার, না মাষ্টার মশাই ?

বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিয়া বসাইয়া দিল।

সুনীতিকুমার বলিল, পাগলি বোনটি ! তোমাদের কথা আমার সব সময় মনে ছিল। কাজের ঝঞ্ঝাটে আসতে পারি নি, তা বলে কি ভুলে ছিলাম ?

—চা করে আনি আপনার জন্যে, কেমন ?

—আচ্ছা। বেশি দেরি ক'রো না যেন, আর শুধু চা এনো। আজ আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে, আমি নিয়ে যেতে এসেচি তোমাদের।

—আমার একটুও দেরি হবে না মাষ্টার মশাই। বলিয়া নাচিতে নাচিতে সে চলিয়া গেল !

কিছুক্ষণ পরে আবদুল, যোবেদা ও আসমানতারা সুনীতিকুমারের সহিত বাহির হইল। আসমানতারার দীর্ঘ ঘোমটা দিবার বদ অভ্যাস নাই। সে সুনীতিকুমারের সহিত নানারূপ গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। যোবেদা এবং আবদুলও তাহার সহিত গল্প করিতেছে। আজ নৈশবিদ্যালয়ের ছুটীর দিন, তাই তাড়াতাড়ি ফিরিবার ভাবনা ছিল না।

সুনীতিকুমার বলিল, দেখ আবদুল, আমরা কয়েকজন মিলে গ্রামের উন্নতির জন্যে একটা কিছু করতে চাই। আমি ছোট বেলা থেকেই কাজের স্বপ্ন দেখে এসেচি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারি নি। এবার হাতে কলমে কিছু করতে চাই। সেদিন তোমার নৈশ-বিদ্যালয় এবং তোমার শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখে আমি খুব খুসী হয়েচি ! চমৎকার কাজ হচ্চে। তুমি যে হিন্দু-মুসলমান মিলনের স্বপ্ন দেখ, মানুষ তৈরী হলে তবে তা সম্ভব হবে। বয়স্ক নরনারীদের কাছে আমি

বিশেষ কিছু আশা করি না। তাদের মন নানা কুসংস্কারে ভরে আছে। কোন ভাল কথা শুনতে চায় না তারা, যারা পরিবর্তন চায়, তারা তাদের ভাল চোখে দেখে না। নানা ভাবে প্রগতিশীলদের বাধা দেয় তারা, নানা যুক্তির অবতারণা করে, বিদ্রূপ করে এবং তাতেও কিছু করে উঠতে না পারলে শেষ পর্যন্ত শত্রুতা করে।

—আমি জানি মাষ্টার মশাই, আমিও অনেক বাধা পেয়েচি ; কিন্তু শক্ত হয়ে থাকলে শেষ পর্যন্ত কেউ কিছু করে উঠতে পারে না, এও আমি দেখেচি। সত্যের জয় হবেই।

যোবেদা দূরে টুপি মাথায় একজন দীর্ঘ দেহ সমর্থ বৃদ্ধকে আসিতে দেখিয়া বলিল, হাজি-সাহেব আসচেন না আবদুল ?

আবদুল সেই দিকে চাহিয়া লক্ষ্য করিয়া বলিল, হ্যাঁ তিনিই।

যোবেদা বলিল, আমাদের দেখলে হয়ত কিছু বল্‌বেন উনি।

—তার জন্যে আমাদের ভাববার কি আছে দিদি ? তুমি বুঝি ভাবচ ঐ নিয়ে ?

—ভেবে আর কি করব, তুমি ত কারুর কথা শুনবে না! সে পুরাতন হাব-ভাব ও সংস্কারের প্রভাব আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। আবদুল দুঃখ পাইবে বলিয়া এসব কথা কখনও তাহাকে বলে না। কিন্তু আজ তাহাদের এই ভ্রমণটাকে প্রাচীনপন্থী হাজি-সাহেব কি চোখে দেখেন ভাবিয়া সে সংকুচিত হইয়া পড়িতে ছিল।

ইতিমধ্যে হাজি-সাহেব নিকটে আসিয়া পড়িয়া ছিলেন। যোবেদা তাঁহাকে দেখিয়া জড়সড় হইয়া রাস্তার এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল ; কিন্তু আসমানতারার কোন পরিবর্তন হইল না, সে তেমনি মাষ্টার মশাইয়ের সহিত উচ্ছ্বসিত আনন্দে বকিতে বকিতে চলিয়াছিল। তবে হাজি-সাহেবকে দেখিয়া মাষ্টার মশাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া রাস্তার এক পাশে সরিয়া গিয়া তাঁহাকে যাইবার পথ করিয়া দিল মাত্র।

হাজি-সাহেব রাগে ও ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ইহাদের দিকে বিশেষ করিয়া আসমানতারার দিকে চাহিলেন এবং বধূটির স্পর্ধিত নির্লজ্জতায় হতবাক হইয়া গেলেন। একটু পরে সামলাইয়া লইয়া অত্যন্ত কড়া গলায় প্রশ্ন করিলেন, বিবি বউ আর বোনকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েচ নাকি হে আবদুল? তা বেশ বেশ! খুব কীর্তি দেখালে! বউটার কি একটু লজ্জাও নেই, হায়াও নেই হে? ক্রমশ কি হতে চলল সব, অ্যাঁ!

আবদুল বলিল, আপনার চোখ দিয়ে দেখলে তাই বটে, কিন্তু আমি এতে একটুও দোষের কিছু দেখতে পাচ্চি না। বেড়ানো কারুর পক্ষেই খারাপ নয়, শরীর মন ভাল থাকে এতে! না বেড়ানোই বরং খারাপ। আর মাষ্টার মশাইয়ের হাত ধরে চলচে বলে বলচেন? আমি মনে করি ওটা ওর সৌভাগ্য, ওটা ওর যোগ্যতা!

—শেষ পর্যন্ত বউকে সামলে রাখতে পারলে হয় হে! উনি না উধাও হন কোনদিন?

আবদুল বলিল, সে ভাবনা আমার।

—ভাল ভাল। আমি অনেক দেখেচি বলেই তাই সাবধান করে দিলাম। বলিয়া আর একবার বধূটির দিকে অগ্নিময় কটাক্ষ করিয়া হাজি-সাহেব চলিয়া গেলেন।

সুনীতিকুমার বলিল, বৌমা, তুমি হাজি-সাহেবের সামনে আমার হাত কি না ধরলেই পারতে না মা? পুরণো লোক ওঁরা, ওঁরা ওসব পছন্দ করেন না।

—আপনার হাত ধরে খারাপ ত কিছু করিনি মাষ্টার মশাই, আপনি কি আমার ওপর এজন্যে অসন্তুষ্ট হয়েচেন? আমার কিন্তু ওসব কিছুই মনে হয় নি।

—আমি অসন্তুষ্ট হইনি, তবে খামোকা তোমাকে কতকগুলো কথা শুনতে হল।

—তা হোক, বিপদ এড়াতে চাইলেই জড়িয়ে ধরে; বিপদকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। বলিয়া আসমানতারা হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাসিভরা মুখখানা কেমন যেন গম্ভীর হইয়া গেল।

আবদুল তাহার পানে চাহিয়া বলিল, মাষ্টার মশাইকে ভুল বুঝো না আসমান, উনি তোমাকে দুঃখের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই ওকথা বলেচেন! তবে তোমাকে ভাল করে চিনলে আর তোমার জন্যে চিন্তিত হবেন না।

সুনীতিকুমার আবদুলের কথা শুনিয়া এবং আসমানতারার ম্লান মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইল। এই প্রস্ফুটিত ফুলের মত সদা হাস্যময়ী সুন্দর মেয়েটিকে কথার আঘাত দিয়া ম্লান করিয়া দিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সে আন্তরিক দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইল। নিজেই তাহার হাত ধরিয়া বলিল, এসো মা, আমার আর ভুল হবে না, এবার ঠিক চিনেচি তোমায়! আবদুলের পানে চাহিয়া বলিল, তুমি একটু সাবধানে থেকো আবদুল, বিপদ ঘটা বিচিত্র নয়। বীরের পথ অবলম্বন করেচ তুমি, দুর্বল তুমি নও; তোমার সাহস আর দৃঢ়তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েচি!

—আমার পথ সত্যের পথ, অন্যায়ের পথ নয়; এ পথে অবশ্যই আল্লাহতায়ালার আশীর্বাদ এবং আপনাদের শুভেচ্ছা লাভ করব। মরণকে আমি ভয় করি না, বিপদকে আমি গ্রাহ্য করি না। আর মরার মত বাঁচতেও চাই না আমি। আসমান আমার মনের মতই হয়েচে, ওর নিজের জীবনী শক্তি আছে। দিদিকে আমি তেমন করে পেলাম না! আজও ও ভয়কে জয় করতে পারে নি, এইটাই আমার দুঃখ!

যোবেদা কথা বলিতে পারিল না, আবদুলের তেজে ভরা মুখখানার পানে চাহিয়া নিজের দুর্বলতা অনুভব করিয়া লজ্জিত হইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পথ শেষ হইয়া গেল, সকলে সুনীতিদের বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল ; সেখানে তখন সমারোহ সুরু হইয়া গিয়াছে ! প্রমথ-বাবু, মীরা, সন্ধ্যাতারা সকলেই আসিয়াছেন। সুনীতিকুমার কয়েকদিন যায় নাই বলিয়াই তাঁহারা তাহার বাড়ীতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ! স্মিতহাস্যে সে সকলকে নমস্কার করিল। বলিল, আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা সকলে আজ আমার বাড়ীতে এসেচেন।

মীরা বলিল, ও কথাটা ত বৌদির উদ্দেশ্যেই বলচেন ? বহুবচনটা ত বাহুল্য ? আমি আর দাদা ত আপনার বাড়ীতে এসেই ছিলাম আগে ?

প্রমথবাবু বলিলেন, খুব সত্যি কথা।

সন্ধ্যা লজ্জিত হাস্যে কহিলেন, বেশ আছেন ভাই বোনে ! কাজ খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমার পিছনে লেগেচেন।

আবদুলরা ইঁহাদের দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। সুনীতিকুমার সংক্ষেপে ইঁহাদের সকলের পরিচয় করাইয়া দিল। যথারীতি পরস্পরের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হইল। সকলে এক জায়গায় গিয়া উপবেশন করিলেন।

সুমনা ইঁহাদের সকলের জন্য চা ও জলখাবার লইয়া আসিল। আবদুল, যোবেদা এবং আসমানতারা চা খায় না, তাহারা খাবার খাইল। প্রমথবাবুর দল সর্বাগ্রে চায়ের দিকেই মনোনিবেশ করিলেন। সংগে সংগে আলোচনাও চলিতে লাগিল। কাহারও সংকোচের বালাই নাই, একই সমাজভূক্ত নরনারীর মত দিব্য আলোচনায় সকলে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। মীরা আসমানকে নিজের কাছে টানিয়া

লইয়া বসাইয়াছিল। মাঝে মাঝে জনান্তিকে তাহাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হইতেছিল। যোবেদা সকলের কথা শুনিতেছিল। সুনীতি-কুমারের মনে মাঝে মাঝে সেই পুরাণো কথাটাই উঁকি দিতে ছিল—মানুষ হিসাবে ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

আবদুল বলিল, মাষ্টার মশাই, আপনার কাজের পরিকল্পনাটা আমাদের শোনান না। কি যে করবেন বলছিলেন?

মীরা বলিল, কি পরিকল্পনা সুনীতিবাবু? বলুন না শুনি।

সুনীতিকুমার বলিল, কিছুই ত করলাম না জীবনে, শুধু স্বপ্নই দেখে এসেচি। এও আমার স্বপ্ন, সফল হবে কিনা জানি না। অবিশ্যি কখনও এসব নিয়ে আলোচনা করিনি কারুর সংগে। এর ভাল মন্দ সুবিধে অসুবিধে আলোচনা না করলে বোঝা যাবে না। কাছেই দুশো বিঘের মত এক খণ্ড পতিত জমি আছে জংগলাকীর্ণ হয়ে। কিনে নেবার মত টাকা পেলে ঐ জমিটা কিনে নিয়ে ওখানে একটা 'আদর্শ পল্লী' স্থাপন করতে চাই।

প্রমথবাবু বলিলেন, ধরুন, টাকা পেলেন এবং জমিটা কিনেও নিলেন; আদর্শ পল্লীটা কি ধরণের হবে?

সুনীতিকুমার বলিতে লাগিল, কয়েকটা বিভাগ থাকবে। যেমন, কৃষি বিভাগ: বেশির ভাগ জমিই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে যত রকমের প্রয়োজনীয় ফসল তৈরী করতে পারা যায়, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করে তা করবার চেষ্টা করা হবে। তারপর ধরুন, ঐ সব ফসলের যতগুলিকে পারা যায়, শিল্পে পরিণত করবার চেষ্টা করা হবে। যেমন সরষে থেকে ঘানিতে তেল তৈরীর, তুলো থেকে সুতো এবং কাপড় তৈরীর চেষ্টা, কাঠ থেকে টেবিল, চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি তৈরীর চেষ্টা। এসব হবে শিল্প বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কাজ। বাণিজ্য বিভাগ খুলে এগুলিকে বিক্রির চেষ্টা করা হবে। শিক্ষা বিভাগ খুলে ছেলেমেয়ে

এবং বয়স্ক নরনারীদের শিক্ষা দেওয়া হবে, অবশ্য রাত্রেই এ বিদ্যালয়ের কাজ চলবে। এই বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হবে। একটি মুদ্রা-যন্ত্র থাকবে। এ থেকে একটি মাসিক পত্রিকা এবং ছোট-খাট উপদেশ মূলক পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র ছাপা হবে। ছেলেমেয়েরা ছাপাখানার কাজ শিখবে এবং বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ঐগুলি প্রচার ও বিক্রির চেষ্টা করবে। একটি স্বাস্থ্য বিভাগ থাকবে। বিভাগীয় কর্তার পরিচালনায় সকলে যার পক্ষে এবং যে বয়সের পক্ষে যেমন উপযোগী, সেইভাবে শরীর চর্চা করবে। কিসে শরীর ভাল থাকে, কি ভাবে রোগ প্রতিরোধ করা যায়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে। সকলকে আত্মরক্ষামূলক বিভিন্ন শারীরিক ক্রীড়া কৌশলের জ্ঞান দেওয়া হবে। একটি চিকিৎসা বিভাগ থাকবে। যদি সতর্কতা সত্ত্বেও কারুর অসুখ বিসুখ হয় কিংবা আকস্মিক বিপদ ঘটে, এই বিভাগ থেকে তাদের চিকিৎসা করা হবে। একটি আর্থিক বিভাগ থাকবে। সমবায় প্রণালীতে কি ভাবে সততার সংগে অর্থ সংগ্রহ ও অর্থের প্রসারতা বৃদ্ধি করা যায়, এই বিভাগ তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্চে চরিত্র গঠন। চরিত্র-বলকে সহায় করে সকলকেই স্বাবলম্বী হতে হবে। যারা কষ্ট সহিষ্ণু নয়, যারা পরিশ্রমে কাতর, যারা কাজ করে নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে চাইবে না, তাদের স্থান আদর্শ-পল্লীতে হবে না। সকলের সংগে সকলের প্রীতি এবং সহযোগিতা থাকবে। অন্যায়কে কখনও সহ্য করবে না এবং ভীরু বা কাপুরুষ কেউ হবে না; আবশ্যক হলে সাহসের সংগে মৃত্যুরও যেন সম্মুখীন হতে পারে, এমন শিক্ষাই দেওয়া হবে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকে।

মীরা আপন মনে বলিল, স্বপ্নই বটে! তবে এ স্বপ্ন যদি কোনদিন বাস্তব রূপ নেয়, তাহলে কী চমৎকারই হবে! কিন্তু এ তো অল্প টাকায় বা অল্প কয়েকজন কর্মী নিয়ে হবে না।

সুনীতিকুমার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কি বলচেন ?

—বলচি খুব চমৎকার আপনার পরিকল্পনা। কিন্তু একে বাস্তবে রূপ দিতে হলে অনেক কর্মী, বহু টাকা এবং দীর্ঘ সময়ের দরকার।

—তাত ঠিকই। সমবায় প্রথায় আমি এই কাজ করতে চাই। কিছু টাকা এবং কিছু কর্মী পেলেও কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। তা কি পাব না ?

—নিশ্চয়ই পাবেন! মহৎ চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না। কিন্তু এর জন্যে আন্তরিক চেষ্টা, অত্যন্ত ধৈর্য এবং প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হবে। আপনি কি রাজী আছেন ?

—রাজী না থাকলে এ রকম পরিকল্পনা নিয়ে স্বপ্ন দেখার কোনই অর্থ হয় না মীরা দেবী।

প্রমথবাবু বলিলেন, আপনি কাজ আরম্ভ করুন সুনীতিবাবু, কিছুরই অভাব হবে না আপনার।

আবদুল বলিল, মাষ্টার মশাই, আমরা সর্বান্তঃকরণে আপনার কাজে যোগ দেব।

সুনীতিকুমার অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিল। কিন্তু মীরার দিক হইতে তেমন কোন সরাসরি সম্মতি না পাওয়ায় কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। সে সর্বান্তঃকরণেই আশা করিয়াছিল যে, মীরা ইহাতে সানন্দে সম্মতি দিবে। তার স্বাধীন মতামতের উপর বা তার স্বাধীন ভাবে চলাফেরার উপর কেউ-ই ত হাত দেন না, তবে ? তবে কি মীরা নিজেই ইহার উপর তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না ? হয়ত ইহাকে আমার একটা আজগুবি খেয়াল বা সাহিত্যসেবীর স্বপ্ন-বিলাস মনে করিয়া লইয়াছে। না হইলে সে আমার চেষ্টা ধৈর্য ও পরিশ্রম সম্বন্ধে ইংগিত করিবে কেন ? ঠিক তাই। সে যাহা বলিয়াছে, তাহা সাধারণ ভাবে সকলকেই বলা চলে। সে

ইহাতে তেমন উৎসাহ বোধ করে নাই। এজন্য সুনীতিকুমার ব্যথিত হইল। তাহার উৎসাহ-দীপ্ত মুখখানা কে যেন সহসা ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিল।

সন্ধ্যাতারা তাহার এই ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে ছিলেন। অন্য সকলে বোধ করি আপন মনে ইহা লইয়া চিন্তা করিতে ছিলেন। কেহই তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখে নাই। আসমানতারা তাহার কাপড়ের খুঁট লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল এবং চিন্তাযুক্ত ভাবে মাটির দিকে চাহিয়াছিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া সুনীতিকুমারের ব্যথা ভরা মুখখানির পানে চাহিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। মাষ্টার মশাইয়ের চোখ দুইটি যেন মীরার মুখের পানে নিবদ্ধ থাকিয়া একদৃষ্টে তাহার মনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতেছে। অল্পক্ষণেই কিছু একটা অনুমান করিয়া আসমান-তারার মুখ মধুর হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! তাহার মনে হইল, সে মাষ্টার মশায়ের মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছে! হঠাৎ মাষ্টার মশায়ের পানে চাহিয়া বলিল, কিছু ভাববেন না মাষ্টার মশাই, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা সকলেই আপনার কাজে যোগ দেব। মীরা-দিও দেবেন। না মীরা-দি?

—নিশ্চয়ই। মীরার কথায় তাহার সুনিশ্চিত গভীর বিশ্বাস ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সুনীতিকুমার অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইল আসমানতারার প্রতি। তাহার মুখে তখন বুদ্ধির দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে। মেয়েটির বুদ্ধি-দীপ্ত মুখখানির পানে চাহিয়া সে বিস্মিতও হইল কম নয়। এই মেয়েটিকেই সে ছেলে মানুষ ভাবিয়াছিল! মানুষ যে কত সময় কত রকমের ভুল করিয়া বসে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

সে দিনের মত বিদায় লইয়া যে যাহার বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। সুমনা বিদায় দিবার সময় আবেগ-পূর্ণ স্বরে বলিল, আপনাদের সকলকে

পেয়ে আজ আমি খুবই আনন্দিত হয়েচি! আশা করি, মাঝে মাঝে আপনাদের দেখা পাব। আসমান-যোবেদা, তোমাদের আমার খুব ভাল লেগেচে ভাই! মাঝে মাঝে সময় করে আসবে, কেমন? মীরা ও সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিল, আসবেন ত মাঝে মাঝে?

সকলে সম্মতি জানাইয়া এবং তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

৭

ইহার পর প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সকলের সমবেত চেষ্টায় সুনীতিকুমারের 'আদর্শ পল্লী' প্রতিষ্ঠার কল্পনা কতকটা বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। সুনীতিকুমার, আবদুল, মীরা, আসমানতারা সর্বদা আদর্শপল্লী সংগঠনের জন্য পরিশ্রম ও চিন্তা করিতেছে। টাকাও মন্দ সংগৃহীত হয় নাই, কর্মী হিসাবেও কয়েক-জনকে পাওয়া গিয়াছে। একশত বিঘার মত পতিত জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। কর্মীগণের কাজের মধ্যেও বেশ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। পরে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে, বাকী একশত বিঘা জমিও যে ইহারাই লইবে, তাহাও জমির মালিককে বলিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি লিখিত-ভাবে সম্মতিও দিয়াছেন। আপাতত একশত বিঘা জমির জন্য তাঁহাকে বৎসরে আড়াইশত টাকা খাজনা দিতে হইবে। জমি লওয়ার সংগে সংগেই এক বৎসরের খাজনা মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পরিকল্পিত সকল বিভাগের কাজই সামান্য ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই কর্মীগণের ও জনসাধারণের মনে আদর্শ পল্লীর সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী অনেকগুলি গ্রামে এবং সংবাদপত্রের মারফৎ সহরাঞ্চলে আদর্শ পল্লীর নামও বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে ইহার ছবিও কাগজে ছাপা হয়। একটি মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপন করা হইয়াছে। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে 'স্বপ্ন ও

সাধনা' নামে একখানি মাসিকপত্রিকা নিয়মিত ভাবে ছাপা হইতেছে। ইতিমধ্যে ইহার গ্রাহক সংখ্যা দশ হাজার হইয়াছে। আদর্শ পল্লীর নানা বিভাগের বিজ্ঞাপন ছাড়া বাহির হইতেও বহু বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। এখানকার প্রকাশিত ছোট ছোট পুস্তিকাও বেশ বিক্রয় হয়। নানা প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া খুব সহজ ভাষায় এগুলি লেখা হইয়া থাকে।

অনেকের দৃষ্টিই আদর্শ পল্লীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেকে ইহার সফলতার সূচনা দেখিয়া সমবায় ব্যাঙ্কে অর্থ বিনিয়োগের কথা চিন্তা করিতেছেন। বহু বেকার যুবক আদর্শ পল্লীর মাধ্যমে কাজ খুঁজিয়া পাইয়াছে। দুই বৎসর পূর্বের পতিত জমিটাকে এখন আর চেনা যায় না; সব সময় স্থানটা যেন কর্ম-কোলাহলে মুখর হইয়া থাকে

দুই বৎসরে মীরার সহিত সুনীতিকুমারের ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়াছে এবং সুনীতিকুমারের লাজুকতাও অনেকখানি কমিয়াছে। মেয়েদের সহিত মেলামেশা করিতে এখন আর সে আগের মত কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু মীরার প্রতি তাহার সুগভীর ভালবাসার কথা আজও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই। কোন দিন পারিবে কি না, তাহাতেও তাহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মীরা যদি কোন দিন আগাইয়া না আসে, তাহা হইলে? অথচ মীরাকে সে সমস্ত অন্তর দিয়া কামনা করে। মাঝে মাঝে সে এজন্য মনে মনে প্রখরবুদ্ধিশালিনী আসমানতারার নিকট সাহায্য পাইবার আশা করে। কিন্তু সেও যেন কাজ লইয়াই পাগল হইয়া রহিয়াছে।

মীরার সনির্বন্ধ অনুরোধে সুনীতিকুমার তাহাকে নাম ধরিয়া ও 'তুমি' বলিয়া ডাকে। মীরা তাহাকে পূর্বের মতই 'আপনি' বলে। তবে মীরাও যে তাহাকে ভাল বাসে, তাহা সুনীতিকুমার বেশ বুঝিতে

পারে। তাহার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি, মীরার সলজ্জ মধুর চাহনি—মাধুর্যে ও রসাবেশে তাহার মন ভরাইয়া দেয়। সময় সময় নিবিড় ভাবে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে মীরাকে। ভাবে, একেবারে নিজের করিয়া কি কোনদিন মীরাকে পাইব? তাহার যেরূপ দরদী মন এবং রুচিজ্ঞান, তাহাকে পাইলে আমার জীবন নিশ্চয়ই মধুময় হইয়া উঠিবে। তাহার স্নেহে, প্রেমে এবং সময়োচিত সেবায় কোন প্রকারের অভাবের বেদনা অনুভব করিবারই অবসর পাইব না। কত সুখের হইবে আমাদের সম্মিলিত জীবন! আবার ভাবে, এ স্বপ্ন হয় ত কোনদিনই সফল হইবে না। নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে কে কোথায় হয়ত ছিটকাইয়া পড়িব. তাহার ঠিকানা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

সময় সময় সুনীতিকুমারের মন বড় উদাস হইয়া যায়, কিছুই আর তখন ভাল লাগে না। নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হয়। কিসের জন্য যেন মন হাহাকার করিতে থাকে। আশা উৎসাহ উদ্দীপনা কর্মোদ্যম—সবই যেন অর্থহীন মনে হয়। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া দেহ মন প্রাণ যেরূপ চায়, সেইভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কর্মের বন্ধন তাহাকে শত পাকে জড়াইয়াছে। নিজের সৃষ্ট কর্মচক্র হইতে বাহির হইবার কোন পথ নাই। তাহার হৃদয়াবেগ তাহাকে অবিরাম যে পথে আকর্ষণ করিতেছে, সে পথে এতটুকু অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সে 'আদর্শ পল্লী'র কর্মীগণের আদর্শ ও মধ্যমণি স্বরূপ, তাহার সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতিতে এই প্রতিষ্ঠানের বিরাট ক্ষতি সাধিত হইতে পারে। তাহার ভাব-বিলাসের অবসর কোথায়? তাহার ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা কর্ম দেবতার পায়ে উৎসর্গীত হইয়াছে। সবই ঠিক, কিন্তু এই অভাবের বেদনা, যাহা সে কোন সময়েই ভুলিতে পারে না, ইহাই তাহার মুখের হাসি, হৃদয়ের স্ফূর্তি ও আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সব

কিছুকেই কাড়িয়া লইবে! তাহাকে প্রাণহীন যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইতে হইবে।

মীরার সান্নিধ্যে যে সে কতখানি আনন্দ অনুভব করে, তাহা সে জানে। তখন তাহার চোখে মুখে সর্বাংগে পুলকের তরংগ স্রোত বহিতে থাকে। সে কাছে থাকিলে সমস্ত কাজেই কেমন উৎসাহ পাওয়া যায়। তাহার উৎসুক দৃষ্টির পানে চাহিয়া কথা বলিতে কত আগ্রহের সঞ্চার হয়। মীরার প্রশংসায় এবং তাহার নীরব সমর্থনে সে সর্বাপেক্ষা আনন্দ ও প্রেরণা লাভ করে। সে কাছে না থাকিলে কোন কাজেই উৎসাহ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; সে যেদিন না আসে, সেদিন ত কিছুই ভাল লাগে না! মীরা-হীন জীবনের কথা ভাবিতেও আতংক উপস্থিত হয়। অথচ চিরদিন যে মীরা কুমারী থাকিয়া আদর্শ-পল্লীর সেবা করিবে, ইহাও সম্ভব নয়। তাহা হইলে কি হইবে? সে আর ভাবিতে পারে না। তাহার প্রাণের আকুতি ত অন্তর্যামী সবই বুঝিতেছেন, তিনি কি তাহার মনের ইচ্ছা পুরণ করিবেন না?

কাজের ফাঁকে এক সময় আসমানতারা আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, সত্যি উত্তর দেবেন ত? যদি কোন অবাস্তব কথা বলি, তাহলে কিছু মনে করবেন না ত? আজকাল আসমানতারা তাহাকে দাদা বলিয়াই ডাকে।

—কি বল না বোন, তোমার কাছে ত আমি মিথ্যে কথা বলি না, আর তোমার ওপর আমি কখনও রাগও করি না। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর। বলিয়া সুনীতিকুমার তাহার পানে উৎসুক ভাবে চাহিয়া রহিল।

—আচ্ছা, মাঝে মাঝে আপনি অত্যন্ত গভীর ভাবে কি ভাবেন বলুন ত? সে সময় আপনার মুখে যেন একটা বেদনার আভাস ফুটে উঠতে দেখতে পাই। কি ভেবে আপনি এত কষ্ট পান, বলুন না দাদা।

—সে জেনে তোমার লাভ নেই বোনটি! আমার দুঃখের

কোন প্রতিকারই হয়ত তুমি করতে পারবে না, মাঝে থেকে কষ্ট পাবে।

—কিছু না করতে পারলেও আপনার গভীর দুঃখের একটু অংশও ত নিতে পারব ?

আসমানতারার জিদ দেখিয়া সুনীতিকুমার অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে। এসব বেদনা ও লজ্জার কথা সে কেমন করিয়া বলিবে তাহাকে ? ভাবিতেও অপরিসীম লজ্জা অনুভব করিতেছে সে। বলিল, আমায় মাপ করো লক্ষীটি, এসব কথা আমি তোমায় বলতে পারব না। কিছু মনে ক'রো না দিদি !

আসমানতারা আর কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হয়, সে ইঁহার গোপন বেদনার কথা সঠিক ভাবেই অনুমান করিতে পারিয়াছে। মীরার প্রতি ইঁহার সুগভীর ভালবাসার সুস্পষ্ট প্রমাণ সে বহুবারই পাইয়াছে। মীরাও যে ইঁহাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে, তাহাও তাহার অবিদিত নাই। কিন্তু কি উপায়ে সে দুইজনের মিলন ঘটাইবে ? কেহই মুখ ফুটিয়া তাহাকে কোন কথা বলেন নাই। মীরার চেহারাও যেন কতকটা কৃশ হইয়া গিয়াছে। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে তাহার। কেমন যেন শান্ত গম্ভীর ভাব। তাহার স্বাভাবিক কলকণ্ঠের হাসি আর তেমন শোনা যায় না, দৈবাৎ হাসিলেও তাহা অত্যন্ত ম্লান মনে হয়। দুজনেই দুজনকে ভালবাসে, উভয়েই পরস্পরকে চায়, অথচ কেহই সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে ইঁহাদের এই পবিত্র-সুন্দর আকুতিময় ভালবাসার কথা কেহ বুঝিতেও পারিবে না। বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে ইঁহাদিগকে ভালবাসিতে এবং শ্রদ্ধা করিতে হইবে, তবেই এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যাইবে। কেহ উদ্যোগী না হইলে হয়ত ইঁহারা আজীবন এই মর্মবেদনা বহন করিয়া চলিবেন, তবুও ইঁহাদের অন্তর অপরের

নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবেন না। এই ভালবাসা সাধারণ-স্তরের সম্ভোগ-মূলক ভালবাসা নয়। দুঃখ-বেদনা এবং বিরহই হয়ত ইহার প্রাণ! আসমানতারা আর ভাবিতে পারে না।

* * * *

ইতিমধ্যে ছয়মাস পার হইয়া গিয়াছে। সহসা জাতির জীবনে দেখা দিয়াছে ছচল্লিশের যোলই আগষ্টের এক অশুভ প্রভাত! সুনীতিকুমার ও আবদুল এবং আসমানতারা ও মীরা গ্রাহ্য না করিলেও তাহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে এক ব্যবধানের করাল যবনিকা!

ব্যক্তিগতভাবে যে সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক নরনারী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে, কিন্তু সম্প্রদায়গতভাবে বিপুল সংখ্যায় যোগ দেয় নাই, তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতার পূর্বাহ্নে সহসা দেখা দিল স্বাধীনতা আন্দোলনকারী সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ করিবার এক অস্বাস্থ্যকর মনোভাব! ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ চলিতে লাগিল—নরহত্যা, নারীহরণ, পাশবিক অত্যাচার, লুণ্ঠন, গৃহাদিতে অগ্নি-সংযোগ! অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভারতবর্ষের দিকে দিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। হাহাকারে দেশ ভরিয়া গেল! মিলনের আদর্শে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন! স্বাধীনতা সম্পদ পাইবার পূর্বেই তাহার বণ্টন লইয়া নারকীয় উন্মত্ততা চলিতে লাগিল! ইংরাজ-শাসন কায়েম হইবার পূর্বে পলাশী প্রাংগণে হিন্দু-মুসলমানের পবিত্র শোণিতের মিলন, মহামানব মহাত্মাজির সাম্প্রদায়িক ঐক্যসাধনের আপ্রাণ চেষ্টা, ভারত মাতার সুসন্তান, বংগজননীর হৃদয়রত্ন, দেশবাসীর প্রাণপ্রিয় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অপূর্ব সাম্প্রদায়িক মিলন-মহিমা ও ঐক্যবদ্ধ ত্যাগপূত বীরোচিত সংগ্রাম, পুনরায় কলিকাতার রাজপথে আজাদ-হিন্দ ফৌজের অন্যতম সেনানী রসিদ

আলির মুক্তির জন্য হিন্দু-মুসলমানের পবিত্র হৃদয় শোণিতের মিলন—সবই জাতি বিস্মৃত হইয়া গেল! এ সবের ঐতিহাসিক সম্ভাবনাময় ইংগিত জাতি গ্রহণ করিতে পারিল না! সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষে সকলের শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল! এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষবাষ্প হইতে কবে যে ভারতবর্ষের জনসাধারণ মুক্তিলাভ করিবেন, তাহা বিধাতাই জানেন।

হে বন্ধু বিদায়

প্রিয় বন্ধু,

দীর্ঘ দশ বছর পরে তোমার চিঠি পেয়ে কত যে আনন্দলাভ করেচি, তা লিখে জানাতে পারি না। ইতিমধ্যে তুমি সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেচ। প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে ক্লান্তিহীনভাবে তোমার লেখনী বিভিন্ন ধরণের গল্প উপন্যাস প্রসব করচে, সেগুলি ছাপাও হচ্চে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা সমূহে। অনেকের মত আমিও তোমার লেখার একজন ভক্ত। যে সব কাগজে তোমার লেখা ছাপা হয়, বেছে বেছে আমি সেগুলির গ্রাহক হয়েচি। কাজেই তুমি না জানলেও তোমার আমার মধ্যেকার যোগসূত্র নষ্ট হতে দেয়নি তোমার রচনাগুলি।

মনে পড়ে একই সংগে আমরা দুজনে ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম। তুমি পাশ করলে, আমি পরীক্ষায় ফেল করে ঘরে ফিরে এলাম চিরদিনের মত স্কুল-কলেজের সংগে সম্পর্ক শেষ করে। আমার মামাকে ত তুমি জানতেই, আমাকে পড়ানোর ইচ্ছে তাঁর মোটেই ছিল না; কেবল মামীর ঝোঁকেই এই পিতৃমাতৃহীন ছেলেটিকে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—তাও আবার ফেল হলে আর আমাকে পড়াবেন না এই সর্তে। মামার সম্পর্কে মামী, না-হলে ত সে পরের মেয়ে? কিন্তু এই পরের মেয়েটিই আন্তরিক দরদ এবং স্নেহ দিয়ে আমার সব দুঃখ দূর করবার জন্যে কি চেষ্টাটাই না করত! মামার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে পক্ষিমাতার মতই সে আমায় তার পক্ষপুটে আড়াল করে রাখতে চাইত। ভাল মানুষ বলে আমার জন্যে অনেক গঞ্জনাই মুখ বুজে সহ্য করেচে সে। মামীই

আমার দুঃখের জীবনে একমাত্র সুখ এবং সান্ত্বনার স্থল ছিল। সেই মামীর মৃত্যুতে আমার সমস্ত বুকখানা খালি হয়ে গেল, পড়াশুনো কিছুই ভাল লাগল না; মা-হারার মা ছিল সে, তাই তার শোক আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করলাম, মামা মনে-প্রাণে এটি চাইছিলেন। তাই আমার অকৃত-কার্যতার কাহিনী সবিস্তারে অতি উৎসাহে যার তার কাছে প্রচার করতে লাগলেন এবং তাঁর অপরিসীম চেষ্টা সত্ত্বেও যে ছেলে এমন অযোগ্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়, তাকে পড়ানো যে অকারণ অর্থ নষ্টেরই নামান্তর, একথা বুঝিয়ে সকলের কাছে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সমর্থিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে লাগলেন।

আমার পড়াশুনো এইখানেই শেষ হল, কিন্তু তুমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোথায় যেন একটা হাই-স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ পেয়ে সেখানে চলে গেলে। মাষ্টারির সংগে সংগে চলতে লাগল তোমার সাহিত্য-সাধনা। আজ তাতে তুমি সিদ্ধিলাভ করেচ—অদম্য উৎসাহ আর নিরলস সাধনার গুণে। কত জায়গায় তুমি হয়েচ সাহিত্য-সভার সভাপতি। দৈনিকে, সাপ্তাহিকে আগ্রহ সহকারে পড়েচি তোমার সে সব অভিভাষণ। ভাষার মাধুর্যে, ভাবের ব্যঞ্জনায়, তথ্য উদ্ঘাটনের কৃতিত্বে এবং তথ্য-বহুল রচনায় তোমার ভাষণগুলি সুসমৃদ্ধ। স্কুল ছেড়েচি, কিন্তু পড়াশুনো ত ছাড়িনি, তাই ধীরে ধীরে এসব একটু একটু করে বুঝতে শিখেচি।

আমায় তুমি ভুলে গিয়েছিলে কি না, জানি না; এর আগে দশ বছরের মধ্যে তোমার কোন চিঠি পাইনি। আমি তোমার বাড়ী থেকে একটা ঠিকানা সংগ্রহ করে তিন চারখানা চিঠি লিখেছিলাম তোমায়, কিন্তু একখানারও উত্তর পাইনি। খুবই অভিমান হয়েছিল

তোমার ওপর। মনে হত, বড় হয়ে তুমি হয়ত তোমার এই দরিদ্র, অল্পশিক্ষিত বন্ধুটিকে আর চাওনা আগের মত। তাই চিঠির উত্তর দিলে না! কিন্তু এখন বুঝেচি যে, আমায় ভুল ঠিকানা দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। যে কারণে আমায় ভুল ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল, সেই কারণেই সম্ভবত তোমাকে জানানো হয়েছিল যে, আমি মামার টাকা চুরি করে কোথায় উধাও হয়েচি। এমনি করে তোমার আমার মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়েছিল। তুমি তোমার এই দরিদ্র হতভাগ্য বন্ধুকে বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতে চাইলেও আমার মত পাকাচোরের সংগে কোন রকম সম্পর্ক না রাখাই ভাল, কারণ এতে সম্মান হানি হতে পারে—একথা জানিয়ে তোমার সে ইচ্ছেকে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তোমার চিঠি পড়ে সবই ধীরে ধীরে বুঝতে পারচি। মানুষের চেষ্টা এবং অপচেষ্টা কত যে অঘটন ঘটাতে পারে, আমাদের ব্যাপারটাই তার একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আজ আমার সব ভুল ভেংগেচে, সব অভিমান দূর হয়েচে। তুমি লিখেচ, আমি এমন ভাল গল্প লিখতে পারি, একথা তোমায় জানাইনি কেন; তুমি এর থেকে ঢের ভাল কাগজে আমার লেখা ছাপার ব্যবস্থা করে দিতে পারতে। আজও তুমি আমায় এমন গভীরভাবে ভালবাস, আজও যে আন্তরিকভাবে তুমি আমার অভ্যুদয় কামনা কর, এতে আমি যারপর নাই সুখী হয়েচি। কিন্তু আমি এখন পরপারের যাত্রী, আমার জীবনে আর কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। আমার পরম সৌভাগ্য যে, তোমার একজন বন্ধু তার পুত্রের কথায় একখানা সস্তাদামের সাপ্তাহিক কাগজে প্রকাশিত আমার গল্পটা পড়ে আগ্রহ করে তোমায় পড়তে দিয়েছিলেন! বিধাতার বিধানে এমন অঘটন না ঘটলে ত আর তুমি আমায় চিঠি লিখতে না, আর আমারও ভুল ভাঙত না। তোমার মত প্রাণের বন্ধুর এবং একজন মহৎ মানুষের বিকৃত পরিচয় লাভ

করেই পরপারে যাত্রা করতাম! তুমি আমায় ক্ষমা কর ভাই! বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক রূপে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ কর—এই আমার আন্তরিক কামনা!

তুমি জানতে চেয়েচ আমার মত অখ্যাত মানুষের জীবন কাহিনী,—কিভাবে কেটেচে এই দশটি বছর। আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার কাহিনীও এই সংগে লিখে জানাব তোমায়। এর আগে কারুকেই একথা জানাইনি। ইচ্ছে করলে ছাপিয়ে দিতে পার আমার এসব কথা তোমার ইচ্ছামত কাগজে। হয়ত আমার ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনীর মুদ্রাঙ্কন কোনদিনই আমার নজরে পড়বে না; কিন্তু যাকে আমি মনে-প্রাণে কামনা করে এসেচি গত আট বৎসরকাল, তার চোখে পড়তেও পারে। এ জীবনে মুখে কখনও তাকে বলবার সুযোগ পেলাম না, 'আমি তোমায় ভালবাসি—হয়ত প্রাণের চেয়েও ভালবাসি, আমার ভালবাসার বদলে তোমার ভালবাসা চাই—তোমায় চাই!'

মামী মরার পর থেকে মামার অবারিত লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনাই আমার ভাগ্যে জুটতে লাগল, ধীরে ধীরে আমার সহন-শক্তি কমে যেতে লাগল, যাবতীয় গৃহকর্ম এমন কি রান্না পর্যন্ত আমায় করতে হত। এত করেও মামার মন পেলাম না, তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করতে পারলাম না। আমার দুর্ভাগ্য বশত তিনি আমায় দেখতে পারতেন না, তাই আমার প্রতিটী কাজের দোষ-ত্রুটি তাঁর চোখে পড়ত। কিন্তু একটা বিষয়ে মামার দৃঢ়তা এবং মতৈক্য দেখেছিলাম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ জিন্নার মত; তিনি কোনদিনই আমায় ভাল চোখে দেখতেন না এবং বিশ্বাস করতেও পারতেন না। পারলে হয়ত তাঁকে সর্বদা অস্বস্তি ভোগ করতে এবং আমাকেও অকারণ লাঞ্ছিত হতে হত না।

আমার যখন সম্পূর্ণরূপে ধৈর্যহানি ঘটল, তখনই একখানা দৈনিক

পত্রিকায় একজন গৃহশিক্ষক প্রার্থীর একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। উত্তর বংগের কোন জেলা সহরের একজন ভদ্রলোক এই বিজ্ঞাপন দিয়েচেন। প্রথমেই বিজ্ঞাপন দাতাকে আমার রওয়ানা হওয়ার খবর পাঠিয়ে আমার পুরণো বইগুলি বিক্রি করে পত্রোত্তরে তাঁর আহ্বান পাওয়ার পর সেখানে যাত্রা করলাম। অবশ্য সামনা-সামনি মামার অনুমতি নিতে পারি নি, একখানা চিঠিতে আমার ঠিকানা না দিয়ে তাঁকে এসব কথা জানিয়েছিলাম এবং লিখেছিলাম, আমার সব দোষ-ত্রুটি তিনি যেন মার্জনা করেন। আমাকে চোর সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আমার এই চিঠিখানা সম্ভবত মামাকে সাহায্য করেছিল। আমার বইগুলি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করা ঠিক চুরি কিনা, আজও ভাল বুঝতে পারচি না।

গৃহ শিক্ষকের কার্যভার পেলাম। পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে দুবেলা পড়াতে হত, আহার্য পরিধেয় ও বাসস্থানের বিনিময়ে। নগদ টাকা কড়ি পাওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমিও প্রথমটা তেমন প্রয়োজন মনে করিনি। পরে মনে হল, টাকা প্রত্যেক মানুষেরই দরকার। যার টাকা থাকে না, মানুষের কাছে তার মর্যাদাও বিশেষ থাকে না। তাই রাত্রের দিকে আর একটা বাড়ীতে তিনটি ছেলেকে পড়াতে লাগলাম। মাসের শেষে দশটি করে টাকা আমার হাতে আসত—এ আমার স্বকীয় উপার্জনের টাকা। প্রথম মাসের টাকা পেয়ে কত আনন্দই যে লাভ করেছিলাম! এতদিনে আমার জীবনে সুরু হল স্ব-অবলম্বন। এর মত সম্মান এবং গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে? এইটাই আমি চেয়ে এসেচি এতকাল; এতদিনে আমার আশা সফল হল। এ বাড়ীতে বইপড়ার বেশ সুবিধে ছিল। নানা ধরণের বই—বিভিন্ন দেশের বিচিত্র ঐতিহাসিক কাহিনী, মূল এবং অনুবাদ; কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, গল্প ও উপন্যাস এবং বিভিন্ন

শ্রেণীর মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা। দুপুরের দিকে আমার কোন কাজ থাকত না; বাড়ীর মালিকের সৌজন্যে ঐ সময়ে পড়তে সুরু করলাম। গল্প উপন্যাসই আমার বেশি ভাল লাগত। মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রিকার রবিবারের গল্পগুলি পড়ে যেতাম। পড়তে পড়তে মনে হত—চেষ্টা করলে আমি এরকম ধরণের গল্প লিখতে পারি নাকি? একদিন লিখতে বসে দেখলাম, কয়েক লাইন লিখেই আমার ভাষা এবং ভাবের পুঁজি ফুরিয়ে গেল, কলম আর চলে না। বুঝলাম, একাজ আমার নয়; এর জন্যে দস্তুর মত সাধনা এবং সম্ভবত ঐশ্বরিক ক্ষমতা দরকার। আমার যে কিছুই নেই! খুবই মন খারাপ হয়ে গেল। এর পর একখানা প্রথম শ্রেণীর বাংলা মাসিকে তোমার একটি গল্প চোখে পড়ল। একবার মনে হল, তোমার সংগে অন্য কোন লেখকের নামের মিল থাকতে পারে ত?

কিন্তু বন্ধুপ্রীতি বশত ওকথাকে বেশি আমল দিলাম না। প্রথম প্রথম তোমার নামের শেষে ডিগ্রিটাও দেওয়া থাকত, আমার নিঃসন্দেহ হবার পক্ষে ওটাও একটা কারণ বটে। ভাবলাম, এম. এ. বি. এ. পাশ করলে বোধহয় লেখা সহজ হয়, ভাষায় খুব দখল জন্মায়! পরে ডিগ্রিধারীদের জ্ঞান বুদ্ধি এবং রচনা শক্তির স্বল্পতা দেখে খুবই বিস্মিত হয়েচি, আগেকার ভ্রান্তিও কেটেচে।

এ বাড়ীর একটি তের চোদ্দ বছরের মেয়ের মনোযোগ মাঝে মাঝে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েচে। দুপুরে আমি যখন বই পড়তাম, মাঝে মাঝে মেয়েটী বই নেবার জন্যে সেখানে আসত। কখনও কখনও দু একটা কথা বলত, কখনও বা শুধু বই নিয়েই চলে যেত। একদিন বলল, 'আপনি বই পড়তে খুব ভালবাসেন বুঝি? চমকে উঠে দেখলাম, মেয়েটী আমার দিকেই চেয়ে রয়েচে কৌতুহলী দৃষ্টিতে।

বললাম, 'বই আমার মন্দ লাগে না, তা ছাড়া দুপুরে ঘুম পায় না, আর হাতেও কোন কাজ থাকে না, এ জন্যেও বই পড়ি।'

'ওঃ' —বলে মেয়েটি চলে গেল। এদিন আর কোন কথা হল না। আমিও মেয়েটির সম্বন্ধে কিছুটা কৌতুহল অনুভব করলাম।

একদিন বসে লেখবার চেষ্টা করচি অর্থাৎ কাগজ কলম নিয়ে ভাবচি। মেয়েটি এসে বলল, 'আপনি গল্প লেখেন না কি?'

কাগজ খানায় লিখেছিলাম—"সর্বহারা (গল্প)" আর কিছুই তখনও লেখা হয়ে ওঠেনি।

বললাম, "লিখিনা, লেখবার চেষ্টা করি।'

মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার কথায়। 'আপনি লিখুন, বুঝলেন? গল্প আমার ভারি ভাল লাগে।'—বলল মেয়েটি।

মেয়েটির কথা আমার পক্ষে প্রেরণা স্বরূপ হয়ে উঠল। মনে হল, আমার লেখা কোন একটা গল্প ছাপিয়ে যদি মেয়েটির হাতে দিতে পারি, সেটা হবে আমার জীবনে চরম সার্থকতা! কেমন একটা আবেগময় প্রবণতা অনুভব করতে লাগলাম। মেয়েটির কথা ভাবতে আমার বেশ লাগে। দেখতে পেলে খুবই আনন্দ হয়, কিন্তু চোখ তুলে তাকাতে পারি না তার দিকে; কেমন যেন লজ্জা করে। তার কথার উত্তর দেবার সময় রক্তে যেন দোলা লাগে, ঠিক জানি না আমার চোখ মুখ বোধ হয় সে সময় লাল হয়ে ওঠে।

কিছুদিনের মধ্যে দেখলাম, মেয়েটিরও বেশ পরিবর্তন সুরু হয়েচে; তার অসঙ্কোচ দৃষ্টিও আমার দিকে চাইতে গেলে দ্বিধা সংকোচে অবনত হয়ে পড়ে। এর আগে ত মেয়েটিকে আমার এত ভাল লাগেনি? আমার চোখে অপূর্ব হয়ে উঠল সে। লাইব্রেরী ঘরে একান্তে আমাদের এই সাক্ষাৎকারকে যেন গোপন অভিসার বলে মনে হতে লাগল।

পরদিন দুপুরে তার আসবার আগেই প্রখর রোদকে অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়লাম। অনেকটা পথ এসে একটা গাছ তলায় বসলাম। মনে হতে লাগল, আমি অন্যায় করেচি। দুর্দিনের আশ্রয়দাতার কিশোরী মেয়েটিকে গোপনে আমি নিজের দিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করচি। জেগে থাকলে অবসর সময়ে আমি তার কথাই ভাবি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাকেই স্বপ্ন দেখি, তাকে ভাবতে ভাল লাগে, তাকে দেখতে ভাল লাগে—এসব কি আমার অন্যায় নয়? আবার মনে হতে লাগল, আমিত তার প্রতি এমন কোন আচরণ করিনি বা তাকে এমন কোন কথা বলিনি, যা সত্যিই অন্যায়। তবে? তবে এত সংকোচ কেন আমার মনে? এইটাইত আমার অপরাধ। কই, আর কারুর সংগে দেখা হলে কিংবা আর কোন কিশোরী মেয়ে আমার সংগে কথা কইলে এ ধরণের সংকোচ বোধ করিনাত আমি? মেয়েটিও ত ধীরে ধীরে সংকোচ বোধ করতে সুরু করেচে? এসব কি অন্যায় নয়?

তুমি সম্ভবত হাসচ আমার মনের ভীরুতা দেখে? কিন্তু সত্যি ভাই, এ যেন এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার।

এমনি করে সপ্তাহ খানেক কেটে গেল। রোজই দুপুরে পালিয়ে যাই মেয়েটির চোখের আড়ালে। একদিন বেরুতে যাব, এমন সময় সম্ভবত একটু দ্রুতপদেই সে লাইব্রেরী ঘরে এলো। তার মুখখানা কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখাচ্চে, একটু যেন কৃশ হয়ে গিয়েচে, মুখে আর সে স্বাভাবিক হাসিটুকু লেগে নেই। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার, ইতিমধ্যে কোন অসুখ করেছিল না কি? না, অন্য কোন কারণ আছে? হয়ত কেউ আড়াল থেকে আমাদের এই গোপন অভিসার লক্ষ্য করে একটা কিছু অনুমান করে নিয়েচে এবং এজন্যে তাকে ভৎর্সনা করেচে। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম আমি। বুকে যেন হাতুড়ির ঘা

পড়তে লাগল আমার। চেয়ে রইলাম মমতা মাখান দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে।

মেয়েটিই বলল প্রথমে, 'দুপুরে কোথায় যান আপনি? আজ সাত দিন দেখিনি আপনাকে?'

'বেড়াতে যাই।'

'বই পড়তে আর ভাল লাগেনা বুঝি আপনার?'

'পড়িত?'

—'এই ত বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, হাতে বই নেইত?'

চুপ করে রইলাম। আবার মেয়েটিই বলল, 'দুপুর রোদে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে কষ্ট হয় না আপনার? আপনি এইখানে বসেই বিশ্রাম করবেন; আমি—আমি না হয় আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না।' ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল তার, হঠাৎ পিছন ফিরে দ্রুত-পদে বেরিয়ে চলে গেল সে। বই নেওয়া আর তার হল না।

এমন করে চলে গেল কেন মেয়েটি, আমার ওপর অভিমান করে কি? কিন্তু শুধু শুধু আমার উপর অভিমান হবে কেন? কি হয়েচে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সেটা ভাল দেখাবে না, ডাকিনি তো কখনও? আসল বাধা আমার দ্বিধা-সংকুচিত মন। এই জন্যেই ডাকতে পারলাম না। মনটা কেমন যেন ভারি হয়ে উঠল।

কয়েকদিন পরের কথা। আমার আশ্রয়দাতা অপরেশবাবু একদিন আমায় ডেকে বললেন, টুলুকে ভাল দেখে কয়েকখানা বই বেছে দিয়ো ত সত্যেন, ও বলে—ভাল বই নাকি আর আমার লাইব্রেরীতে নেই! বই না পেয়েই পাগলির মন খারাপ হয়ে গেচে। ওর মন ভার হওয়া আমি সহ্য করতে পারি না।

আমি তাঁর সরলতায় মুগ্ধ হলাম। বললাম, 'টুলুকে আপনি ডেকে দিন লাইব্রেরীতে, আমি তাকে ভাল বই বেছে দিচ্চি।'

কিছুক্ষণ পরে টুলু এলো, বলল—'ডেকেচেন আমাকে?'

—'হ্যাঁ। আর আসনা যে তুমি লাইব্রেরীতে? তুমি এলে আমি বিরক্ত হই, একথা বুঝলে কি করে?'

—'তবে প্রতিদিন দুপুরে বেরিয়ে যেতেন কেন?'

—'সে তোমার ওপর বিরক্ত হয়ে নয়, অন্য কারণে।'

—'কি কারণ, আমায় বলতে পারেন না?'

—'সে তুমি শুনতে চেয়োনা।'

বলল বটে, 'আচ্ছা'; কিন্তু মুখ তার আবার গম্ভীর হয়ে উঠল।

বললাম, 'শোন, রাগ ক'রোনা আমার ওপর, তুমি দুঃখ পাবে জানলে আমি দুপুরে বেরিয়ে যেতাম না।'

—'আমি দুঃখ পেলে কি আপনার কষ্ট হয়?'

বিস্মিত হয়ে মুখের পানে চেয়ে দেখলাম তার, এই কয়দিনেই যেন লঘু চপলতা দূরে গিয়ে এই উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরীটির মুখে শান্ত গাম্ভীর্যের সমাবেশ হয়েচে, এবং বয়সও যেন কিছু বেড়ে গিয়েচে। তার কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, 'বই নেবেনা তুমি?'

—'নেব, আপনি পছন্দ করে দিন।'

এর পর থেকে প্রায়ই লাইব্রেরীতে আসে এবং আমার পছন্দ করা বইগুলি পড়বার জন্যে নিয়ে যায়। পড়ে কিনা, জানি না; কিন্তু 'বই কেমন লাগল' জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'বেশ!'

মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিও সে পড়ে। গল্প পড়তে তার ভাল লাগে বলে আমি লেখবার জন্যে সময় পেলেই চেষ্টা করি। একটু একটু করে লেখা আসতে লাগল। আগে লিখতে পারতাম না, এখন পারি; ভাল হয় কি না, বুঝতে পারি না। এক একবার মনে

হয়, সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে যে সব গল্প ছাপা হয়, আমার লেখা বোধ হয় তার থেকে নিতান্ত খারাপ নয়। কোন কোন গল্পের থেকে ত ভালই মনে হয়। একনলেজমেণ্ট সংগে দিয়ে রেজিস্ট্রী করে পাঠাই কাগজের অফিসে, সংগে অনুরোধ-পত্র দিই। কিছু দিন পরে কোন কোনটা ফিরে আসে, কোনটার বা খোঁজই পাওয়া যায় না। হতাশ হয়ে পড়ি। ভাবি, যাঁরা গল্প বাছাই করেন, তাঁদের সাহিত্য-বিচারের দৃষ্টি আমার থেকে আলাদা। না হলে একটাও ছাপা হয়না কেন? একটা ছাপা হলেও টুলুকে পড়তে দিয়ে আনন্দ লাভ করি, পাণ্ডুলিপি তাকে পড়তে দিতে কেমন লজ্জা করে। জানি ত, তাকে পড়ানোর পরই তার অনুরোধ মত কাগজের অফিসে পাঠাতেই হবে। আর আমার লেখা যে ছাপা হবে না, সে সম্বন্ধে আমার লেশ মাত্র সংশয় নেই।

ইতি মধ্যে টুলুর বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। আমার মুখ যেন ক্রমশ রক্ত-শূন্য হয়ে আসচে, মনে একটুও আনন্দ নেই; সমস্ত আশা-আকাঙ্খার যেন সমাধি হতে চলেচে, বুকখানা খালি হয়ে যাচ্চে ক্রমশ। কিছুই ভাল লাগেনা আমার। একথা নিঃসংশয়ে জানি যে, আমার এবং টুলুর বুক যদি গুঁড়িয়েও যায়, তবুও এই আসন্ন ব্যবস্থার রদ-বদল হবে না। টুলুরও মুখে আনন্দের আভাস মাত্র নেই, আসন্ন মিলনের রাগিনী তাকে উৎফুল্ল করতে পারেনি একটুও। আমি বেশ বুঝলাম, আমার এবং টুলুর বুকে এখন একই কথা জাগচে—একই প্রিয় বিরহের বেদনা উভয়ের মনকে ভারাতুর করে তুলচে।

অপরেশবাবুর কথা মত আমি টুলুর বর পছন্দ করতে গিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, আমার বর পছন্দ হয়নি, কিন্তু টুলুর বাপের উৎসাহ দেখে সে কথা মুখেও আনতে পারিনি। ফিরে আসার পর টুলুর মা বললেন, 'কেমন দেখলে বাবা, তোমার মত হবে ত?'

তাঁর কথার উত্তরে বললাম, 'জানি না, আমার থেকেও ভাল হবে'

সম্ভবত। টুলুর বাবাকে জিজ্ঞাসা করবেন সব কথা—আমার বড় মাথা ধরেচে, এখন যাই।'

—'ওঃ, তাই তোমার মুখখানা এমন শুকনো দেখাচ্চে, না? শুয়ে পড়োগে বাবা তোমার ঘরে। টুলু, যাতো মা, সত্যেনকে একটু বাতাস করবি!'

আমি চলে এলাম, টুলুও একটু পরে একখানা পাখা হাতে নিয়ে আমার ঘরে এলো। আমি চোখ বুজে পড়ে রইলাম, সে বাতাস করে যেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে বললাম, বাতাস করে আর কি হবে টুলু? এরকম অভ্যেস আমার মত ছন্নছাড়া সর্বহারার না থাকাই ভাল। তুমি চলে গেলে যখন মাথার যন্ত্রনা হবে, কে দেখবে বলত?

কোন উত্তর না দিয়ে সে বাতাস করে যেতে লাগল। এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিয়ে হয়ে গিয়েচে। আত্মীয়-কুটুম্ব বরযাত্রী সকলেরই খাওয়া দাওয়া চুকে গেচে। সারাদিন ছুটোছুটি করেচি, জলস্পর্শ করার ইচ্ছে হয়নি। এখন অপরিসীম ক্লান্তিতে দেহ মন অবসন্ন। আমার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। দরজা বন্ধ করার কথা মনে ছিল না। চোখে ঘুম নেই, চোখ বুজে পড়ে আছি মাত্র। হঠাৎ আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল টুলু, বাসর থেকে পালিয়ে এসেচে, চোখ দিয়ে হু-হু করে জল পড়চে তার, ফুলে ফুলে কাঁদচে সে। এই অতর্কিত ঘটনায় আমি যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম; কি যে করব, ঠিক করতে পারচি না! তাকে বুকের মধ্যে এমন একান্তে পেয়ে আমার গোপন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়েচে; কিন্তু শংকায় মন ভরে উঠচে। এ থেকে হয়ত কত অনর্থেরই সৃষ্টি হবে। তার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, 'ওঠো লক্ষীটি, এখনই কেউ এসে এ অবস্থায় আমাদের দেখলে সর্বনাশ হবে।'

সে ত উঠলই না বরং আরও জোরে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরল, পরম নিশ্চিন্তে নিঃশঙ্ক ভাবে আমার বুকের ওপর মাথা রাখল সে। চোখ দিয়ে তখনও তার জল ঝরে পড়চে। কতক্ষণ কেটেচে এমন ভাবে জানি না, জ্যোৎস্নালোকে আমার ঘর ভরে গেচে। হঠাৎ টুলুর মা আমার ঘরে এলেন। পায়ের শব্দ খুব নিকটে আসতে চমকে উঠে বললাম, 'ছাড় আমায় টুলু, কে আসচেন, উঠে দেখ।' টুলু তেমনি ভাবেই পড়ে রইল। মা আমার কথা শুনতে পেয়েছিলেন। একেবারে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস রোধ করেই সম্ভবত বললেন, 'ওঠ্ মা টুলু, দাদাকে তুই ভালবাসিস জানি; কিন্তু এমন করতে নেই মা।'

টুলু তেমনি ভাবে থেকেই জবাব দিল, 'কোথাও যাব না মা আমি এখান থেকে।' একি করচে টুলু, ওর কি লজ্জা সংকোচ কিছুই নেই? আমি যে লজ্জায় মরে যাই! জোর করে সরিয়ে দিলাম তাকে, ঘরের মেঝের ওপর বসে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সে। তাকে সরিয়ে দেওয়া নয়, এ যেন আমার হৃৎপিণ্ডকেই উপড়ে ফেলা!

পরদিন শ্বশুর বাড়ী চলে গেল সে। যাবার সময় তার কান্নার অর্থ আমি এবং সম্ভবত তার মা—দুজনে অন্যরকম করেছিলাম।

টুলুর স্বামীর কোন একজন বন্ধু রাত্রে তাকে বাসর ঘর থেকে আমার ঘরে চলে আসতে দেখে আড়াল থেকে সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছিল। পরে রমেনকে সমস্ত ঘটনা জানায়। সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে টুলুর স্বামী রমেনের মন টুলুর ওপরে। এই থেকেই চলতে থাকে নির্যাতন এবং লাঞ্ছনা।

বাপের বাড়ী আসাও বন্ধ হয়ে যায় তার।

অপরেশবাবু টুলুকে আনতে গেলে রমেন জানিয়ে দেয়, ওকে আবার

মাষ্টার-বাবুর সংগে প্রেম করবার জন্যে পাঠান যেতে পারে না ; নিয়ে গেলে কিন্তু একেবারেই নিয়ে যেতে হবে। অপরেশবাবু অবাক হলেন, জামাইয়ের এই নির্লজ্জ স্পর্ধিত উক্তিতে। এই রকম স্নেহ এবং সহানুভূতিহীন জায়গায় সর্বাপেক্ষা স্নেহময়ী কন্যাকে চিরদিনের মত রেখে আসতে তাঁর মন চাইল না। জামাইয়ের কথামত আপাতত চিরদিনের মতই সম্ভবত মেয়েকে নিয়ে এলেন তিনি। এই ব্যাপারে টুলুর স্বামীর সংগে তার শ্বশুরের আশ্চর্য মতৈক্য দেখা গেল।

শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে আসার পর হতেই টুলুকে অত্যন্ত গম্ভীর মনে হতে লাগল। আমার সংগে আর তেমন কথা বলে না, কাছেও আসে না। এমনি ভাবে তিন মাস কেটে গেল। টুলুর শ্বশুরের একখানা চিঠিতে জানা গেল, আবার তার স্বামী বিয়ে করেচে। আর একটি বিস্ময়কর সংবাদ, টুলু সন্তান সম্ভাবিতা। যথাসময়ে একটি পুত্র প্রসব করল সে। ছেলের প্রতি টুলুর অপরিসীম স্নেহ যত্ন। আমার কাছ থেকে তেমনিই সে দূরে সরে থাকতে চায়। অনেক সময় দেখি, পাড়ার অন্য একজন যুবকের সংগে টুলু বেশ মেলামেশা করচে, হাসচে, গল্প করচে। আমাকে সে ভুলেই গিয়েচে যেন। আমি অবাক হয়ে যাই। অপরিসীম বেদনায় বুকটা টনটন করতে থাকে। ভাবি, টুলু আমায় ভুলে গেল, আমি তাকে ভুলতে পারচি না কেন ?

একদিন আমার খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার ঘরের পাশ দিয়ে টুলু যাচ্ছিল, নির্লজ্জের মত তাকে ডাকলাম, 'টুলু, আমাকে একটু বাতাস করবে ভাই, ভারি মাথার যন্ত্রণা হচ্চে আর বুক ধড়ফড় করচে আমার ; আসবে ভাই একটু ?'

—'আপনার ছাত্রকে পাঠিয়ে দিচ্চি।' বলে টুলু একটুও অপেক্ষা না করে চলে গেল। আমার চোখ দিয়ে হু-হু করে জল পড়তে লাগল। একদিন দেখি, টুলু তার স্বামীর একটি ছোট ফটোর পানে এক দৃষ্টে চেয়ে

আছে। আমি পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি দেখে তাড়াতাড়ি ফটোখানা বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। আমি উত্তরোত্তর তার ব্যবহারে বিস্মিত হচ্ছিলাম।

মাথার যন্ত্রণা এবং বুক ধড়ফড়ানি দিন দিন বেড়েই চলেচে। দেহ মন ক্রমশ অবসন্ন হয়ে আসচে। উৎসাহ-আনন্দ-উদ্যম কিছুই যেন নেই আমার। ছেলেমেয়েদের পড়াবার সময়টুকু ছাড়া সব সময় আমি লেখাপড়া নিয়েই থাকি। বাড়ীতে থাকতে পারি না, বাইরে বাইরে ঘুরি। বাইরেই বেশির ভাগ সময় লেখাপড়ার কাজকর্ম করি। টুলুর মুখে আর কোনদিন এজন্যে এতটুকু অনুযোগ শুনলাম না।

আজকাল তৃতীয় শ্রেণীর মাসিকে সাপ্তাহিকে আমার কিছু কিছু লেখা ছাপা হচ্চে। একদিন টুলুকে বললাম, 'আমার একটা গল্প ছাপা হয়েচে টুলু, পড়বে?'

টুলু জবাব দিল, 'না, আমার আর পড়াশুনো ভাল লাগে না।'

—'আমার গল্পও ভাল লাগবে না তোমার?'

—'না-না-না, হলত? আর কি সর্বনাশ চান আমার আপনি?'

—'আমি—আমি তোমার সর্বনাশ চাই! কি বলচ তুমি টুলু?'

—'ঠিকই বলচি, আপনি আমাদের বাড়ীতে না এলে এমন সর্বনাশ আমার হত না। কেন আমি হতভাগিনীর মত বাপের বাড়ীতে পড়ে রয়েচি জানেন? সে শুধু আপনারই জন্যে!'—বলে সে নিদারুণ অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

অমরেশবাবুকে বললাম, 'আমি এবার চলে যেতে চাই এ বাড়ী থেকে। কারণ, আমার অসুস্থ শরীরের জন্যে আর তেমন ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারচি না। এ অবস্থায় আমাকে রাখলে আপনার ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনোর খুবই ক্ষতি হবে।'

তিনি বললেন, 'তুমি আমাদের দুঃখে-বিপদে যা করেচ বাবা, তার

তুলনা হয় না। এ জন্যে তোমার কাছে আমরা চিরঋণী। টুলুর জন্যে তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করেচ বলা যায়! তুমি আমাদের বাড়ীর ছেলের মত। কোথায় যাবে বাবা তুমি, বিশেষতঃ শরীরের এই অবস্থায়? এতখানি অকৃতজ্ঞ আমরা হতে পারব না বাবা।'

টুলুর মা এলেন। বললেন, 'তোমাদের কথা আমি সবই শুনেচি বাবা। তুমি আমার নিজের ছেলের মত। তুমি চলে গেলে আমি যে বাঁচব না বাবা।' ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে।

আমি মুগ্ধ ও বিচলিত হলাম, তাঁদের সুগভীর স্নেহের এই পবিত্র প্রকাশ দেখে! টুলু একটু দূরে বসে তার ছেলের জন্যে একটা জামা তৈরী করছিল। সে একবার চেয়েও দেখল না।

আজকাল প্রায়ই আমার ঘুসঘুসে জ্বর হয়, বুক ধড়ফড় করে এবং মাথার যন্ত্রণা হয়। অপরেশবাবু অনেক চিকিৎসা করিয়েচেন, কিন্তু ডাক্তাররা জবাব দিয়েচেন, আমার মৃত্যু অত্যন্ত দ্রুত সন্নিকট হয়ে আসচে। টুলু জিজ্ঞাসাও করে না একবার—'কেমন আছেন মাষ্টার মশাই?'

আমার জীবনটা অভিশপ্ত নয় কি? একটা খামখেয়ালী মেয়ের একরাত্রের খেয়ালটাকেই আমি সব চেয়ে বড় করে দেখলাম, তার সমস্ত উপেক্ষা এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সত্বেও! টুলুর ভালবাসা পেলে আমি ধন্য হতাম, আমার জীবন সার্থক হয়ে উঠত, এমন করে অকালে শেষ হত না। তাই দুঃখের সংগে তোমায় শেষ বারের মতই জানাচ্চি—হে আমার প্রিয়তম বন্ধু, বিদায়! ইতি

তোমারই সত্যেন।

সাহিত্য রস

অনিমেষ সাহিত্য-পাগল, সব সময় বইয়ের বস্তা নিয়ে ঘোরা-ফেরা করা তার অনেক দিনের অভ্যাস। বিয়ে তার হয়েছিল, কিন্তু বৌ শিক্ষিতা এবং আধুনিক চালচলনে অভ্যস্তা নয় বলে তার সংগে সে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখে না। বৌকে লেখাপড়া শিখিয়ে মনের মত করে গড়ে নেবার জন্যে সে অনেক চেষ্টাই করেছিল ; কিন্তু সবই ব্যর্থ হওয়ায় সে হাল ছেড়ে দিয়েচে। দূর সম্পর্কের এক পিসিমার কেউ কোথাও না থাকায় তার ছন্নছাড়া সংসার দেখাশুনো করার ভার নিয়েচেন এবং তাকে দুবেলা দুমুঠো রান্নাও করে দেন। কিছুদিন তত্ত্বাবধান করার ফলে অনিমেষের ওপর তাঁর মায়াও পড়েচে ; তাই সময় এবং সুবিধে মত তার ভালোর জন্যে কিছু কিছু সদুপদেশও দেন। কিন্তু সে সব চোরের কাছে ধর্মের কাহিনীর মত অপ্রিয় না হলেও আধ পাগলা অনিমেষটা তাঁর কথা কান পেতে শোনেও না। তাই আজ কাল তিনি যেন কতকটা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েচেন।

অনিমেষের পিতার আমলের কয়েক বিঘা ধানের ও আলুর জমি আছে, সেইগুলো ভাগে দিয়ে এক রকম করে তার ছোট সংসার চলে যায়। সংসার চালানোর জন্যে তাকে বিশেষ পরিশ্রম বা বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, তাই তার সাহিত্য-সাধনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেচে। মাঝে মাঝে তারই মত আরও দু চার জন সাহিত্য-পাগলকে জুটিয়ে নিয়ে সে সাহিত্য-সভার অনুষ্ঠান করে, নাম করা সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করে আনে, আদর-আপ্যায়ন করে। একবার সে চাঁদা তুলে একখানি ছোট-খাটো মাসিক-পত্রিকাও বার করেছিল। আশা ছিল, তার পত্রিকায় অনেকে বিজ্ঞাপন দেবে এবং অনেকেই পত্রিকার গ্রাহক হবে।

হয়েও ছিল সব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকা পয়সা বিশেষ কেউ দিল না, ফলে পত্রিকার অকাল-মৃত্যু ঘটল। এখনও সে পত্রিকা প্রকাশের আশা একেবারে ত্যাগ করেনি। 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী'—কবির এই বাণী তাকে যথেষ্ট প্রেরণা জোগায়। শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হবার দুর্বার কামনা নিয়ে সে বিভিন্ন শ্রেণীর পত্রিকা-অফিসে রচনা পাঠিয়ে অনেক পয়সা নষ্ট করেচে। কোথাও কোথাও রচনা প্রত্যাখ্যাত হয়েচে, কোথাও বা সেগুলি বাজে কাগজের টুকরিতে আশ্রয় লাভ করেচে, কোথাও কোথাও বা ছাপাও হয়েচে, কিন্তু তার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প। অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠাবার জন্যে কিংবা কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে ডাক-টিকিট পাঠিয়ে সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেচে; তথাপি সে কোন কিছুতেই ধৈর্যহীন হয়নি।

একবার পার্শ্ববর্তী একটা গ্রামে সাহিত্য-সভার আয়োজন হল। সে গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম নয়, অনেকেই আবার ধনী। গ্রামের সাধারণ আভিজাত্যের কথা দূর-বিশ্রুত। স্কুল, পোস্ট-অফিস, স্যানিটারী-অফিস, রেল-স্টেশন, পুলিশ-স্টেশন, দোকান, বাজার, দাতব্য-চিকিৎসালয় —কিছুরই অভাব নেই। সাহিত্য সভায় একটা রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও হয়েচে। গল্প এবং প্রবন্ধ রচনায় যাঁরা প্রথম স্থান অধিকার করবেন, তাঁদের একখানি করে ভাল বই পুরস্কার দেওয়া হবে—ঘোষণা করা হল। একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিককে সভাপতি মনোনীত করা হয়েচে।

অনিমেষকেও খাতির করে একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র দেওয়া হয়েচে। সে ভাবল, শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হবার এও একটা সুযোগ বটে! সে একটা গল্প রচনা করতে উঠে পড়ে লেগে গেল। তার ধারণা, গল্প সে নিতান্ত খারাপ লেখে না; প্রবন্ধ রচনা তার ভাল আসে না, তাই সে ওদিকে মাথা ঘামাল না। কয়েকদিনের চেষ্টায় সে মেজে ঘসে একটা

গল্প খাড়া করল। গল্পটা পরিষ্কার করে ফুলস্কেপ কাগজের একপিঠে লিখে পাঠিয়ে দিয়ে সে দিন গুণতে লাগল। পুরস্কারের প্রতি তার তেমন লোভ না থাকলেও একজন বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিকের হাত থেকে প্রতিযোগিতার পারিতোষিক নেওয়ার চিত্রটা কল্পনা করে সে মাঝে মাঝে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগল। সে সময়ে সভার সমস্ত লোকের দৃষ্টি পুরস্কার গ্রহণকারীর দিকে। কি চমৎকার সে দৃশ্যটা! সে বার বার নিজেকে প্রথম প্রতিযোগির স্থলাভিষিক্ত কল্পনা করে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে লাগল।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন পার হয়ে গেচে। আজ সাহিত্য-সভার অধিবেশন। অনিমেষ যখন সভায় উপস্থিত হল, তখন 'বন্দেমাতরম্' সংগীত শেষ হয়ে কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ হয়েচে। বহুক্ষণ ধরে বিভিন্ন ভংগীতে সভাপতি এবং শ্রোতাদের ধৈর্যহানি ঘটিয়ে কবিতা আবৃত্তি শেষ হল। তারপর এল প্রবন্ধ পাঠের পালা। সভায় পড়বার জন্যে অনিমেষ শেষ পর্যন্ত একটা ছোটখাটো প্রবন্ধও লিখে এনেচে। কয়েকজনের পর সভাপতির আহ্বানে সে উঠে পড়তে আরম্ভ করল।

সাধারণত আমরা বর্তমানের ক্ষেত্রেই—রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করেই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমাদের মনকে আবদ্ধ রাখি, কিন্তু বর্তমানের এই তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, গৌরব-বোধকে অতিক্রম করে যে অব্যাহত আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হচ্চে, কয়জন সে আনন্দের আস্বাদ পায়? কয়জনই বা আত্মার সেই আনন্দানুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারে? যে পারে সে ধন্য!......

সভাপতির উৎসুক দৃষ্টি এবং জনসাধারণের করতালি ধ্বনির মধ্যে অনিমেষের প্রবন্ধ পড়া শেষ হল। সে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে কতকটা কুণ্ঠিত ভাবে সভার একপাশে বসে পড়ল।

একজন বন্ধু বলল, বেশ লেখাটি ত তোমার অনু, তুমি যখন পড়,

সে সময়ে সভাপতি তোমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। অপরের পড়ার সময়ে কিন্তু একবারটি মুখটা দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েচেন!

অনিমেষ যেন আর আনন্দাবেগ চেপে রাখতে পারছিল না। সত্যি সভাপতি সব সময় তার দিকে চেয়েছিলেন? সত্যি?···

সভাপতির দীর্ঘ অভিভাষণের পর পুরস্কার বিতরণের কাজ আরম্ভ হল। প্রথমেই দেওয়া হল কবিতার প্রথম প্রতিযোগীকে। প্রবন্ধ-গুলির কোনটিই পুরস্কার যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পারিতোষিক দেওয়া স্থগিত রইল। তারপর এল গল্পের পালা। অনিমেষ স্পন্দিত দুরু দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ঘোষণা করা হল, সেই গ্রামেরই একজনের গল্প পুরস্কার পাবার যোগ্য বিবেচিত হয়েচে। অনিমেষের মুখ ম্লান হয়ে গেল। সভার অনুষ্ঠাতারাই রচনাগুলি বিচার করেছিলেন, এখন সভার সম্পাদক গল্পটা সভায় পড়ে শোনাতে লাগলেন। ক্ষণকাল পূর্বে পড়া তার নিজের প্রবন্ধোক্ত 'বর্তমানের ক্ষেত্রেই' অনিমেষের অবুঝ মন আবদ্ধ হয়ে রইল। সংকীর্ণ সীমার পারে যে 'অব্যাহত আনন্দ স্রোত' প্রবাহিত হচ্চে, তা অনুভব করবার প্রশান্তি তার তখন নষ্ট হয়ে গেচে!

শুনতে শুনতে অনিমেষের মনে হতে লাগল, গল্পটা তার গল্পের চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ? ভাব, ভাষা, বর্ণনারীতি—কোনটাকেই প্রশংসনীয় মনে হল না! বিচারকদের নিরপেক্ষতার সম্বন্ধে তার মনে সংশয় উপস্থিত হল। সে তার গল্পের একস্থানে যে কথাগুলো লিখেছিল, সেই কথাগুলো আবার তার মনে উঠতে লাগল:

···সকলের দৃষ্টি সমান নয়। না হলে একজন মানুষ যে তৃণ লতা গুল্মগুলিকে উদ্ধত ভাবে দুপায়ে মাড়িয়ে চলে, আর একজন তার মধ্যে থেকে অসাধারণ মাধুর্যের সন্ধান পায় কি করে? একজনের দৃষ্টিতে যে নারী শুধু বিলাস-সঙ্গিনী, আর একজনের দৃষ্টিতে সেই নারী

সম্মাননীয়া ও মহিয়সী মূর্তিতে দেখা দেন কি রূপে? একজনের দৃষ্টিতে যে তাজমহল কেবলমাত্র শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দানশীল সৌধ মাত্র, আর একজন তারই মধ্যে থেকে প্রেম পুলক ব্যথা-বেদনা ও বিরহ মাধুর্যের অমিয় নির্ঝর আবিষ্কার করে কি করে? কারুর মতে স্বার্থসাধন এবং ভোগ-বিলাসই জীবন ধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য, কেউ পরের জন্যে, মহত্তর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে—ত্যাগ-স্বীকার করতে পারাকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে করে!

দৃষ্টি বিচারের তারতম্য আছে বৈকি!…

———

সমাজ কল্যাণ

মনোরমা তাহার মাতুল হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার মত দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। সম্প্রতি সে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য কোনটারই অভাব ছিল না, কিন্তু যাহা থাকিলে ভাল ঘরে এবং উপযুক্ত বরে বিবাহ হইতে পারে, তাহার মামার সেই বস্তুটিরই—অর্থাৎ টাকার অভাব ছিল।

মনোরমা সংসারের কাজ-কর্ম, এমন কি রান্নার কাজ পর্যন্ত এখন ভালই শিখিয়াছে। দরিদ্র মামার সংসারে টাকার অভাব থাকিলেও সেবা-যত্ন ও পরিচ্ছন্নতার অভাব ছিল না। মনোরমা নিজের হাতে কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করিত, ঘর-দ্বার নিকাইয়া মুছিয়া পরিচ্ছন্ন রাখিত, রান্না করিত, ভাত তরকারী সাজাইয়া ধরিয়া দিত, বাসন মাজিত, মামাকে পান তামাক সাজিয়া দিত। কারণ, হরিশবাবু নিজে এবং তাঁহার ভাগ্নী মনোরমা ছাড়া সংসারে আর কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। তাই ভাগ্নীর কাজকর্মে দক্ষতা দেখিয়া তাঁহার আনন্দই হইয়াছিল। এই মা-বাপ মরা মেয়েটিকে কন্যার অধিক যত্নে মানুষ করিয়াছিলেন এবং চলনসই রকম বাংলা লেখাপড়াও শিখাইয়া ছিলেন।

হরিশবাবু নিশ্চিন্ত-নিরুদ্বেগে পান ভোজন, তামাকু সেবন করিয়া বড় আনন্দেই দিন কাটাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্নীর বিবাহের ভাবনা ভাবিয়া পাড়ার লোকের আনন্দ নষ্ট হইতেছিল, মুখে অন্নজলও তেমন রুচিতেছিল না। অতএব, তাঁহার সুদিনের আনন্দ জল-বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাইবার উপক্রম হইল। পাড়ার পাঁচজনে ত্বরায় মেয়েটিকে পাত্রস্থ করিবার জন্য অযাচিত উপদেশ দিতে লাগিলেন। কারণ, আর দেরি করিলে সমাজ-ধর্মরূপ টেকসই প্রাসাদও ভাঙিয়া পড়িতে বিলম্ব

হইবে না। চোখের সামনে এরূপ বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটিতে দেওয়াও পাঁচজন সামাজিক নরনারীর পক্ষে বাস্তবিকই সহনাতীত ব্যাপার। কাজেই পাঁচজনের অযাচিত করুণায় নিশ্চিন্ত হরিশবাবু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। মনোরমার জন্য পাত্র অন্বেষণে তাঁহাকে উত্তরীয় কাঁধে, ছাতা মাথায়, চটি পায়ে পথে বাহির হইতে হইল।

কন্যা যতই সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এবং গৃহকর্ম-নিপুণা হউক, অভিভাবকের পর্যাপ্ত টাকা না থাকিলে উপযুক্ত ঘর-বর বড় একটা মেলে না। এক্ষেত্রেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। কন্যার রূপ গুণ স্বাস্থ্য লইয়া কি পাত্রের অভিভাবকেরা ধুইয়া খাইবেন? টাকা না হইলে গহনাপত্র, কাপড়-জামা এবং বৈবাহিক অনুষ্ঠানের অন্যান্য খরচাদির সমস্যার সমাধান হইবে কি প্রকারে? নিমন্ত্রিত আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নিরাভরণা একটি মেয়েকে বধূ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জায় মাথা কাটা যাইবে না? প্রবীণ হরিশবাবুর এ রকম একটা হাস্যকর প্রস্তাব উত্থাপন করিতে একটুও সংকোচ হইল না, ইহাতেই পাত্রের অভিভাবকেরা আশ্চর্য হইয়া গেলেন! অতএব, প্রবীণ হরিশবাবুকে তাঁহার হাস্যকর প্রস্তাব পরিপাক করিয়া ক্ষুণ্ণমনে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল।

এই সব আলাপ-আলোচনার পর হয়ত সমাজ-নীতি জ্ঞান-হীন হরিশবাবু একটা নিরুপায়-নির্ভাবনার ভাব দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে পাড়ার পাঁচজনের দুর্ভাবনার পরিমাণ একটুও কমে না! এ সম্বন্ধে গ্রামের মোড়ল মতি-মুখুজ্জে মশাইয়ের দুশ্চিন্তার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং তিনি এবং আরও দু একজন মনোরমাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহারা নিছক পরোপকার প্রবৃত্তি বশত ঐকান্তিক চেষ্টায় একটি সর্বাংশে উপযুক্ত পাত্রও সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন।

পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনী প্রভৃতিতে জাজ্বল্যমান বৃহৎ সংসারের মালিক, বিপুল ভূসম্পত্তি ও অর্থের অধিকারী ষাট বৎসর বয়স্ক গ্রাম্য সমাজ-পতি মৃতদার মহেশ্বরবাবু নিতান্ত করুণা পরবশ হইয়াই মনোরমার পাণিগ্রহণ করিয়া নিরুপায় ব্রাহ্মণের জাতি ও মেয়েটির ধর্ম রক্ষা করিবার শুভ-সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন! শুধু তাহাই নহে, ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের সংবাদ অবগত হইয়া একান্ত উদারভাবে ইহাও জানাইতে তিনি ভুলেন নাই যে, হরিশবাবুকে এই বিবাহে এক পয়সাও খরচ করিতে হইবে না এবং বিবাহের পূর্বেই তিনি মেয়েটিকে আশাতীত বস্ত্রালংকারে ভূষিত করিবেন! একথা শুনিয়া হাতের কাছে স্বর্গ পায় না, এমন নির্বোধ মানুষ পৃথিবীতে কম, কিন্তু সংসার ও সমাজ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হরিশবাবু ইহাতে অতিশয় ভাবিত হইয়া পড়িলেন। কি উপায়ে তিনি যে প্রাণসমা স্নেহের পুতলী মনোরমাকে স্বার্থ-সর্বস্ব ধূর্ত মতি-মুখুজ্জের স্বার্থপরতার হাত হইতে এবং অতিক্রান্ত যৌবন মহেশ্বরবাবুর লালসা-দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবেন, সেই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন।

সেকালের ঋষিদের মতে মহেশ্বরবাবুর বয়স 'পঞ্চাশোর্ধ' হইয়া অরণ্য-বাসের উপযুক্ত হইলেও তাঁহার কর্মশক্তি একটুও শিথিল হয় নাই। তিনি করণীয় কার্য ঝটিতি করিতে ভালবাসিতেন। তাই তিনি শীঘ্রই একদিন শুভদিন দেখিয়া মনোরমাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য শুভাগমন করিলেন। সংগে আসিলেন মতি মুখুজ্জে মশাই। মুখুজ্জে মহাশয়ই এই আসন্ন শুভ-সম্মিলনের প্রধান উদ্যোক্তা। কাজেই হরিশবাবু নাসিকা বিবরে সরিষা তৈল নিষেক পূর্বক গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেও তিনি ত আর সত্যই নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারেন না। তাই শুভাশীর্বাদের আয়োজন করিবার জন্য ইতিপূর্বেই তিনি তাঁহার পতিগতপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রীকে হরিশবাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মহেশ্বরবাবু বিবেচক লোক, তিনি মুখুজ্জে মশায়ের হাত দিয়া

একখানি দামী শাড়ী, জামা ও কয়েক ভরি সোনার গহনা হরিশবাবুর বাড়ীর ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন, মেয়েটিকে সময়োপযোগী সাজে সজ্জিত করিবার জন্য। মনোরমার মত সৌভাগ্য কয়জনের হয়? কিন্তু নির্বোধ হরিশবাবুর এই ঘটনায় একটি দুঃখের নিঃশ্বাস পড়িল মাত্র!

হঠাৎ এরূপ সৌভাগ্যের সমাবেশ দেখিয়া সচকিত হইয়া মনোরমা মামাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হরিশবাবু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া মনোরমাকে পাত্র-পক্ষের শুভাশীর্বাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। মনোরমা বাঁকিয়া বসিল, সে বিবাহ করিবে না; কেন না তাহা হইলেই অক্ষম অনভিজ্ঞ ও নির্বিরোধী মামাকে একাকী সাংসারিক দুঃখের সহিত লড়াই করিবার জন্য ফেলিয়া যাইতে হইবে। সে প্রাণ থাকিতে এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইবে না! নিমজ্জমান ব্যক্তির জলের উপর ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দেখিয়া আশান্বিত হওয়ার মত হরিশবাবুর বদনমণ্ডলও একটা ক্ষীণ আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! কিন্তু সংসার-অভিজ্ঞ ঝুনা সমাজপতি মতি মুখুজ্জে স-স্ত্রীক এই ধিঙ্গি মেয়েটার পাকামো এবং হরিশবাবুর ভাবগতিক দেখিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন,—"গিজিতাকৃসিন, মহেশবাবুকে ভিজে বেড়াল পেয়েচ, না? সমাজের ঠেলা এখনও বোঝনি কিনা!"

সমাজপতি মতি মুখুজ্জে মহাশয় যখন মনোরমাকে ঠেলিয়া লইয়া বৈঠকখানায় হাজির করিলেন, তখন মহেশ্বরবাবু অশ্রুমুখী লাবণ্যময়ী মনোরমার সারা অঙ্গে যৌবনের সমারোহ দেখিয়া এক মুহূর্তেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। যদি বৃথা চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া এমন রত্নকে উপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আফসোসের সীমা থাকিত না। অতিক্রান্ত যৌবন মহেশ্বর বাবুর মুগ্ধ অপলক দৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রেমের বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া বদ্ধদৃষ্টিতে তিনি মনোরমার রূপসুধা উপভোগ করিতে লাগিলেন। মতি মুখুজ্জে বুড়ার ভীমরতি দেখিয়া তাহাকে সচেতন করিতে প্রয়াস পাইয়া কহিলেন, মহেশবাবু,

আপনাকে কৃপা করে এই গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতেই হবে, মেয়েটিকে অপছন্দ করলে চলবে না।

পরে মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, বোস্ মনো, ওঁর দয়ার শরীর, ভাবনা কি ?

মহেশ্বরবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সেকি কথা মুখুজ্জে মশায়, গরীব ব্রাহ্মণ, বিপদে পড়েচেন, আমরা না দেখলে হবে কেন ? এই শুনেই ত থাকতে পাল্লুম না ! বলি, হোক্ বয়স, এতে আমার পুণ্য বাড়বে বই কমবে না ; লোকে আমাকে যাই বলুক !

মতি মুখুজ্জে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, আপনার মত মানুষ কি আর হয় ! আমাদের সমাজের পরম সৌভাগ্য ! এ কথা শুনলে লোকে আপনার কত গুণ কীর্তন করবে !

মনোরমা সেই যে আসিয়া প্রথম মহেশ্বরবাবুকে দেখিয়া স্তব্ধভাবে নত মস্তকে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়াছে, আর সে মাথা তোলে নাই, ইহাদের কথাবার্তার কসরৎও বোধকরি বা তাহার কানে যায় নাই। সে আপন দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছিল।

মুখুজ্জে মশায়ের স্ত্রী আশীর্বাদের দ্রব্যাদি আনিয়া ইংগিত করিতেই মুখুজ্জে মশায় সেগুলি ভিতরে লইয়া আসিলেন। হরিশবাবুর চেহারা দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন নিমজ্জমান ব্যক্তির মত হাঁফাইতেছেন।

—তাহলে হরিশ, আর দেরি করা উচিত হবে না, শুভক্ষণ বয়ে যাচ্চে। বলিয়া মুখুজ্জে মশায় আশীর্বাদের দ্রব্যগুলি ইংগিতে হরিশবাবুকে দেখাইয়া দিলেন। হরিশবাবুর নিকট হইতে এই ইংগিতের কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। মতি মুখুজ্জে ভিতরে ভিতরে ক্রোধে ফুলিতে থাকিলেও যথাসম্ভব শান্তভাবে পাত্র পাত্রীকে আশীর্বাদের জন্য প্রস্তুত হইলেন। হঠাৎ মনোরমা মেঝের উপর ঢলিয়া পড়িল। হরিশবাবু মনোরমাকে ধরিয়া আর্তস্বরে বলিলেন, কি হলো মা ?

যে সাড়া দিবে, সে তখন হতচৈতন্য হইয়া মেঝেয় লুটাইতেছে। মহেশ্বরবাবু এই ঘটনায় হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। বলিলেন, মুখুজ্জে মশায়, মেয়েটির কি মৃগী রোগ আছে নাকি ?

হরিশবাবু তখন ভাগ্নীকে সামলাইতে ব্যস্ত, তিনি জবাব দিলেন না। কিন্তু মতি মুখুজ্জে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ও সব ঢঙ, বুঝলেন না মহেশবাবু, ও সব আজকালকার ঢঙ! মেয়ে নভেলীয়ানা শিখেচেন!

এই সর্বজ্ঞ গ্রাম্য-প্রধানের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া যে প্রিয়দর্শন যুবকটি প্রবেশ করিল, তাহার এই গ্রামেই বাড়ী এবং সে পাশের গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সেবক-সমিতির সম্পাদক। বৎসরখানেক পূর্বে পরলোকগত পিতার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র মালিক হইয়া সেবক সমিতি গড়িয়া তুলিয়া সে আর্ত ও অভাবগ্রস্তের সেবা কার্যে মাতিয়া উঠিয়াছে।

যুবকটি জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে হরিশকাকা ?

হরিশবাবু সাগ্রহে বলিলেন, এই যে নির্মল, এসো বাবা। মনো হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েচে। একটু দেখতে পারো ?

—তা দেখচি, কিন্তু এ সব কি ? বলিয়া আশীর্বাদের জিনিষগুলি দেখাইয়া দিল।

—পাত্র জোগাড় করতে পারিনি বাবা টাকার জন্যে, তাই ইনি দয়া করে— বলিয়া মহেশ্বর বাবুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

নির্মল জিজ্ঞাসা করিল, মনো আর কখনও মূর্ছিত হয়েছিল কি ?

—না বাবা।

—হুঁ, বলিয়া নির্মল মনোরমার প্রতি মনোনিবেশ করিল এবং কিছুক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

হরিশবাবুর প্রতি কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্মল বলিল, পাত্র মেলাতে পারেন নি বলে যার তার হাতে—

হরিশবাবু তাহার কথা শেষ না হইতেই ভয়চকিত স্বরে বলিলেন,

আমাকে কিছুই করতে হয়নি বাবা, মতি জ্যেঠা অনেক কষ্টে মহেশ্বর বাবুকে রাজী করেচেন।

—আমাকে তো কিছুই বলেন নি? আশীর্বাদ কি হয়ে গেচে?

নির্ম্মলের অনেক টাকা আছে বলিয়াই হউক অথবা সে উচ্চশিক্ষিত এবং গ্রামের যুবকেরা তাহার একান্ত বাধ্য বলিয়াই হউক কিংবা যে কারণেই হউক, মতি মুখুজ্জে মহাশয় এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। এবার নীরবতা ভংগ করিয়া বলিলেন, আশীর্বাদ একরকম হওয়াই নির্ম্মল, কেবল দুটো ধান দুব্বো মাথায় দেওয়ার অপেক্ষা। ব্রাহ্মণ বিপদে পড়েচে তাই, না হলে—

—যাক আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, আর আপনাদের কষ্ট করতে হবে না, আমি মনোর বিয়ের ভার নিলাম।

মতি মুখুজ্জে যেন সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, তার চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে বাবা? তবে কিনা, হরিশ নিতান্ত বিপদে পড়েচে বলেই ইনি দয়া করে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলেন?

—ওঁর মহত্বের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে! কিন্তু আর ওঁকে কষ্ট দিতে চাইনে।

হরিশবাবু মনে মনে পরম করুণাময় ভগবানের প্রতি শতকোটি প্রণাম নিবেদন করিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে নির্ম্মলের পানে চাহিয়া বলিলেন, মনোর পরণে যে কাপড় গহনা রয়েচে, ওগুলো মহেশবাবুর দেওয়া, তুমি একটু অপেক্ষা কর বাবা, আমি এখনি ওগুলো পাঠিয়ে দিচ্চি—বলিয়া মনোরমাকে লইয়া তিনি বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় মনোরমা নির্ম্মলকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি উপহার দিয়া গেল!

মহেশ্বরবাবু বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে মনোরমার অপস্রিয়মান যৌবন-শ্রী মণ্ডিত তনুলতার পানে চাহিয়া রহিলেন!

১৫ই আগষ্ট,' ৪৮

১৫ই আগষ্ট আসিতেছে।

গত বৎসরের কথা সতীশের মনে পড়িয়া গেল। প্রথম রাষ্ট্রীয়-পরাধীনতার গ্লানি অপনোদনের দিন সেটা। ইংরাজ শাসকগণ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতেছে! কোন জবরদস্তি-মূলক ব্যাপারের মধ্য দিয়া এই মহনীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতেছে না; ভারতবাসী নরনারীর ত্যাগ, দুঃখবরণ ও আত্মাহুতির ফলেই স্বেচ্ছায় বন্ধুভাবে তাহারা দুইশত বৎসরের রাষ্ট্রীয় শাসন-কর্তৃত্ব ত্যাগ করিতেছে! পরস্পরের জাতীয় পতাকাকে পরস্পরে অভিবাদন করিতেছে, এই সুমহান্ দৃশ্যের তুলনা মেলেনা ইতিহাসে! কত আশা, কত উৎসাহ, কত আনন্দ, কত গৌরব! সর্বপ্রকার আলস্য দেহমন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তৎপরতার সংগে ভারতকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সর্বপ্রকার অভাব-অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক ভারতবাসীর মহান্ কর্তব্য রহিয়াছে—স্বাধীন ভারতকে কেন্দ্র করিয়া সকলকেই এই কর্তব্য পালন করিতে হইবে; কাহারও দায়িত্ব কম নহে। রচনাত্মক আলোচনা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করা ছাড়া যাহা কিছু করা যাইবে, সবই হইবে ভারত বিরোধী—আত্মঘাতী নীতি। ভুল হইলেই তাহাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে করাও সব সময়ে বিজ্ঞোচিত কাজ হইবে না। যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি ব্যাহত হইতেছিল, বহু সাধনায় তাহা করতলগত হইয়াছে, ইহাকে হেলায় হারাইলে চলিবে না, মণিরত্নের মত—শ্রেষ্ঠ সম্পদের মত তাহা সতর্ক প্রহরায় সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

এক বৎসর পরে আবার সেই পরম বাঞ্ছিত দিনটি ফিরিয়া আসিল

ভারতবাসীর জীবনে। কিন্তু সেই উৎসাহ, সেই উন্মাদনা, সেই চাঞ্চল্য কোথায়? গত বৎসর স্বাধীন ভারতের পতাকা স্কন্ধে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে সগর্বে দৃঢ়-পদবিক্ষেপে সে গ্রাম-পরিক্রমণ-শীল বিরাট মিছিলের অগ্রবর্তী হইয়াছিল! জাতির পিতার ঘাতকের হস্তে শোচনীয় প্রাণাহুতির ফলেই কি তাহার মন অসাড় নিষ্পন্দ হইয়া গিয়াছে? নাকি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আদর্শচ্যুতি ও ভোগ-বিলাস লোলুপতার জন্যই তাহার মন বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে? অথবা জনগণের কর্তব্যপরায়ণতার অভাবের জন্যই তাহার মন ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে? কর্মব্যস্ত জীবনের স্বল্প অবসর মুহূর্তে ইহাই সে ভাবিয়া চলিয়াছিল। কখনও মনে হইতেছে, ইংরাজ-শাসকমণ্ডলী মহাযুদ্ধের অজুহাতে ভারতীয়দের জীবন-রসটুকু নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইয়াছে, তাই জাতীয় জীবনে স্পন্দন নাই। কখনও মনে হইতেছে, বৃটিশ আমলের আমলাগণকে কর্মে নিযুক্ত রাখার ফলেই বৃটিশ চলিয়া গেলেও শোষণের কাজটা সমানভাবেই চলিতেছে। তাই শোষিত ভারতবাসীর জীবনে আশা এবং আনন্দ নাই। বৃটিশ আমলে যাহারা অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল জাতির সেবকগণের উপর, আশ্চর্যের কথা এই যে, তাহাদেরই পদমর্যাদা বৃদ্ধি হইতেছে এবং পদোন্নতি ঘটিতেছে! নির্যাতিত অক্ষম বৃদ্ধ দেশ কর্মীদের সাহায্যের নামে চলিতেছে অভিনয়! সতীশ যেন ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

তাড়াতাড়ি একটা জামা টানিয়া লইয়া পরিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। কি একটা অস্বস্তি এবং আশঙ্কায় তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছে, যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা ত পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন মাত্র। ইহা ত বহু পূর্বেই পাওয়া যাইত, ইহার জন্য ভারত বিভাগ করার কিংবা সাম্প্রদায়িক হানাহানি মানিয়া লওয়ার কোনই প্রয়োজন হইত

না। যাঁহার সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল, তিনিই ত এখন ভারতের প্রধান-মন্ত্রী। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা-ত প্রতিষ্ঠিত হইল না! ইংরাজের কাছ হইতে এ রকম যে বিকল্প প্রস্তাব পাওয়া যাইবে, নেতাজী সুভাষ কি সে সম্বন্ধে জাতির উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন নাই? ভাল কথা, জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীই কি ভারতের বর্তমান স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হইতে পারিয়া ছিলেন? মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর বিবেকহীন নির্লজ্জ শোষণের ও চোরা কারবারের ফলেই কি গোটা জাতটাই মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে নাই? কে ইহাদের শোষণ-প্রবৃত্তি শায়েস্তা করিবে? পণ্ডিত নেহরু ত এই সব চোরা কারবারীদের লাইটপোস্টে টাঙাইতে চাহিয়াছিলেন! তিনিই যে নিজেকে অসহায় বোধ করিতেছেন!

চলিতে চলিতে অন্যমনস্ক ভাবে সতীশ ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের গৃহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। সম্পাদক ছিলেন না, তাঁহার স্ত্রী মঞ্জুশ্রী কলকণ্ঠে আহ্বান করিলেন সতীশকে—'অনেকদিন পরে যে ঠাকুরপো, এসো এসো!'

মঞ্জুশ্রী বসিবার জন্য তাহাকে একটা মাদুর পাতিয়া দিল। চিন্তিত গম্ভীর মুখে সতীশ উপবেশন করিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যেনদা কোথায় বৌদি?'

'তিনি গেচেন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে স্বাধীনতা দিবসের ব্যবস্থা করবার জন্যে। কিন্তু তোমাকে এমন চিন্তিত দেখচি কেন ভাই? কি হয়েচে তোমার?'

'কি আর হবে, দেশের অবস্থার কথাই ভাবচি, দিনে দিনে কি হতে চলল বলত?

'ওসব জাহাজের খবর রেখে কি হবে ভাই, আমরা ত আদার ব্যাপারী? তার চেয়ে বরং আমরা কি করতে পারি, সেই কথাই ভাবা

তাল। আমরাও ত আমাদের কর্তব্য ঠিক ঠিক পালন করচি না ভাই! যা তা ভেবে কেবল মন খারাপ করচি আর সব জিনিসের কড়া সমালোচনা করচি; ঐ সময়টায় বরং নিজের নিজের সামর্থ্য মত কিছু কিছু কাজ করলে দেশের উপকার হত! নিজেরা হয়ে গেচি অলস, কর্মকুণ্ঠ, দোষ দেখচি নেতাদের আর রাষ্ট্র পরিচালকদের। আমরা মনে করি, নেতারা আর রাষ্ট্র-পরিচালকরা আমাদের যা কিছু দরকার, সব করে দেবে। শুধু চায়ের দোকানে আর বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায় রাজনীতি নিয়ে গরম গরম আলোচনা করেই আমরা নিজেদের অকৃত্রিম দেশহিতৈষী ভাবি! গান্ধীজি কর্মশক্তির ওপর নির্ভর করতে বলতেন, পরমুখাপেক্ষী হতে বলেননি। কিন্তু আমরা হয়েচি কি? বাড়ীর সামনে একটা রাস্তা খারাপ হলে ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডে দরখাস্ত পাঠাতে পারি, কিন্তু এক কোদাল মাটি দিতে পারি না! ম্যালেরিয়ায় দেশ উজোড় হয়ে যাচ্চে, বাড়ীর পাশের ঝোপ-জংগল পরিষ্কার করবার মত উৎসাহ আমাদের নেই! আমরা রাত্রে আলো জালিয়ে পাঁচ জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্প করতে পারি, কিন্তু ঐ সময়টায় দুচারজন বয়স্ক নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দিতে পারি না। বাড়ীর সামনে বা কাছে এখানে ওখানে টুকরো টুকরো জমি পড়ে থাকলে সেগুলিতে শাকসব্জী বা অন্যান্য ফসলের চাষ করা আবশ্যক মনে করি না। সুবিধে পেলে আমরাও দীন-দরিদ্রের অপমান করতে বা তাদের শোষণ করতে দ্বিধা করি না! এমনি আমাদের দেশ-প্রেম! আমরা করি অপরের কাজের সমালোচনা! তুমি রাগ করচ নাকি ভাই আমার কথায়?'

সতীশ অকৃত্রিম বিস্ময়ে এই স্বল্প-ভাষিনী মেয়েটির সহসা অগ্ন্যুৎপাতের মত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া চলিয়াছিল। মঞ্জুশ্রীর কথাগুলি অনুপ্রেরণার মত তাহার মর্মে প্রবেশ করিয়া আঁটিয়া বসিতেছিল। কথাগুলি তাহাকে সত্যই অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে।

বলিল, 'না না, রাগ করচি না, তোমার কথাগুলি আমার সত্যিই ভাল লেগেচে।'

'সত্যিই ভাল লেগেচে? বেশ তাহলে কাজে লেগে যাও। তোমাদের দেখে যারা কাজ করে, তোমরা চুপ করে বসে থাকলে, তারা কি করবে বলত? তোমরাও ত ছোটখাট এক একটি নেতা!'

'না বৌদি, আমরা নেতা নই, আমরা সেবক মাত্র!' মঞ্জুশ্রী হাসিয়া বলিল, 'বেশ তাই। এখন ১৫ই আগষ্ট কি ভাবে স্বাধীনতা দিবস পালন করবে, বসে বসে সেটা চিন্তা করো; তবে কর্ম্মসূচীটা যেন রচনাত্মক হয়। আমি বরং ততক্ষণ তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি, কেমন?'

—'আচ্ছা।'

নব জন্ম

শীতের শেষ। দ্বিপ্রহর বেলায় হাড় পর্যন্ত কাঁপাইয়া বাতাস বহিতেছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে সূর্যের যে স্তিমিত আলো পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিতেছে, তাহা শীতার্ত মানুষগুলিকে তেমন প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। যাহাদের এখনও স্নান করা হয় নাই, তাহারা শীতের জন্য নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে। অনেকেই স্নান না করিয়াই আহার্যের জন্য তাগিদ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভবেশ শীতের দিনে প্রায়ই স্নান করে না। আজ সে স্নান করিবার কথা চিন্তাও করিল না। বধূ অমলা ভাত ধরিয়া দিতে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, তোমার ত চান করবার বালাই নেই, বেশ আছ তুমি!

ভবেশ মুখ ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিল। অমলার মুখ খানিতে তখনও কৌতুক হাস্যের রেখা লাগিয়া আছে। এই মেয়েটি অসুস্থ না হইলে কোনদিন স্নান করিতে অবহেলা করে না।

উচ্ছ্বসিত-যৌবনা বধূটির স্বাস্থ্য-শ্রী ভরা দেহের পানে চাহিলে চোখ ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছা হয় না। তাহাকে দেখিয়া স্বাস্থ্যহীন ভবেশের হিংসাও হয়, ভালও লাগে! এ এক বিচিত্র অনুভূতি তাহার! মেয়েটী খাটিতেও পারে খুব, সর্বদাই একটা না একটা কাজ লইয়া চরকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার স্বচ্ছন্দ লীলাচঞ্চল গতি ভবেশের মনে মোহন আবেশের সৃষ্টি করে।

অমলার বয়স আঠারো উনিশ বছর। এখনও সন্তান হয় নাই বলিয়া গ্রামের যুবতী ও বৃদ্ধারা তাহার সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে সে বোধ হয়

বন্ধ্যা হইবে। এখন হইতেই দেবদেবীর দুয়ারে গিয়া সন্তান কামনায় মানত করা ও মাদুলী কবচ ধারণ করা প্রয়োজন। না হইলে শেষ পর্যন্ত প্রতিকারের বাহিরে চলিয়া যাইবে। এরূপ ঘটনা নাকি তাহারা অনেক দেখিয়াছে। ইহাতে কোন শুভ ফল না ফলিলে শেষ পর্যন্ত বংশ রক্ষার্থে ছেলের বিবাহ দিতে হইবে।

অমলা চমকিয়া ওঠে, কিন্তু শাশুড়ীর উদ্বেগশূন্য মুখ ও তাঁহার সহজ কথাবার্তা শুনিয়া সে আশ্বস্ত হয়।

শাশুড়ী বলেন, কি এমন বয়স বৌমার, যে এখন থেকেই ওসব কথা নিয়ে এত ভাবতে হবে?

হিতৈষিণীরা গালে হাত দিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলে, কি এমন বয়েস? ওমা যাবো কোথা!

শাশুড়ী বলেন, ও রকম করে বোলোনা তোমরা, ওতে আমার কষ্ট হয়, বৌমা আমার লক্ষ্মী মেয়ে!

—তোমার লক্ষ্মী তোমার থাকুক দিদি, আয়গো নিস্তার, গৌরি—

তাহার আহ্বানে পাড়ার মেয়েরা কাজের অজুহাতে উঠিয়া যায়।

শাশুড়ীর মুখখানি মুহূর্তের জন্য ম্লান হইয়া আবার সহজভাব ধারণ করে। অন্তরাল হইতে অমলা আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া সান্ত্বনার সুরে বলে, কেন মা, আপনি আমার জন্যে পাড়ার লোকের কাছ থেকে কথা শোনেন? ওঁরা আপনার কথা ঠিক না বুঝলেও আমি ত আপনাকে জানি।

—ওদের কথা, ওদের পরামর্শ আমার ভাল লাগে না মা, তাই উত্তর না দিয়ে পারি না। জানি, ওরা আড়ালে আমাদের নিন্দা করে, আমাদের কথা নিয়ে হাসাহাসি করে। কিন্তু গায়ে পড়ে উপদেশ দেওয়া যে কতখানি খারাপ, সে ওরা বুঝবেনা কোনদিন।

—তবে? ওঁদের সংগে তর্ক না করাই ত ভাল মা! শাশুড়ী ভিতরে ভিতরে কতখানি উত্তেজিত হইয়াছেন, অমলা তাহা বুঝিল। সে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

বধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার চুমা খাইয়া শাশুড়ী বলিলেন, পায়ে হাত কেন মা শুধু শুধু?

অমলা লেখাপড়া ভালই জানে। দরিদ্র বাপ মায়ের মেয়ে সে। যত্ন করিয়া পিতা নিজে তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইয়াছেন ও সংসার-পথে চলার সম্বন্ধে নানা মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন। মা পরম যত্নে তাহাকে সংসারের প্রয়োজনীয় কাজকর্মে দীক্ষা দিয়াছেন এবং হাতে কলমে সব শিখাইয়াছেন। রোগে সেবাশুশ্রূষা, বিপদে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ধৈর্য, হিসাব রাখা ও সংসার-তরণীকে ঠিক পথে চালাইয়া লওয়ার দক্ষতা তাহাকে শ্বশুর বাড়ীতে যে মহিমা দান করিয়াছে, শত্রুও মনে মনে তাহার প্রশংসা করে। ফলে ভবেশের বিশেষ সাংসারিক জ্ঞান ও কাজকর্মের দায়িত্ব-বোধ না থাকিলেও অমলার গুণে সংসার ঠিক মত চলিয়া যায়! যে পিতৃ-মাতৃহীন শিশুটি কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের মত একদিন ভবেশের মায়ের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই বর্তমানের যুবক শিবুই অমলার পরিচালনার গুণে বাহিরের চাষ-আবাদের কাজ সুন্দর ভাবে চালাইয়া যায়। বাড়ীর সকলের স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে শিবু ভুলিয়াই গিয়াছে যে, সে এ বাড়ীর ছেলে নয়। পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ লইয়াই নিরলস অমলার যোগ্য শিষ্য ও সহকর্মীর মত সে সব কাজ করিয়া যায়।

ভবেশ একদিন স্নেহের সুরে অমলাকে বলিল, তুমি শিবুকে মানুষ করে তুললে অমলা, কিন্তু আমার ত একটা গতি করতে পারলে না? অনেক সময় মনে হয়, যদি আমি অলস চিন্তা আর দলপাকিয়ে দেশ

উদ্ধারের বদ মতলব ত্যাগ করে তোমার কাছে সত্যিকার দেশের কাজের দীক্ষা নিতে পারতুম, তাহলে আমার অনেক উপকার হত! পারোনা তুমি আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিতে?

অমলা ভবেশের গোপন বেদনা জানে। দেশ-সেবার সম্বন্ধে তাহার বহু পরিকল্পনা থাকিলেও এ পর্যন্ত সে কার্যতঃ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই দুঃখ ও হীনতাবোধ তাহাকে সময়ে অসময়ে কাঁটার মত বিঁধিতে থাকে।

অমলা হাসিমুখে বলে, তুমি ত আর শিবু নও যে, নির্বিচারে আমার কথা শুনবে? তুমি চিন্তাশীল মানুষ, আমি শুধু গাধার মত খাটতে পারি মাত্র।

—না, আমি দেখচি তুমিই ঠিক কাজ করচ অমলা। আমি ত দেখচি, আমার দ্বারায় সংসারের কিংবা সমাজের এতটুকু উপকার হচ্চে না, বরং আমিই বিনা পরিশ্রমে ভাতের গ্রাস মুখে তুলচি,. তোমার চেয়ে ঢের বেশি কাপড় জামা ব্যবহার করচি। বিনা পরিশ্রমে এই খাওয়া-পরাটাকে সংসারে চৌর্যবৃত্তি ছাড়া আর কি বলা যায়? না অমলা, এই আলস্য জড়তা থেকে তুমি আমায় উদ্ধার কর। বিনা প্রতিবাদে আমি তোমার কথামত কাজ করব। জানি, এজন্যে অনেকেই আমাকে বিদ্রূপ করবে, তবুও আমি আর কিছু গ্রাহ্য করব না। নিজেকে আমি তোমার চেয়ে অনেক উঁচু দরের মানুষ বলে মনে করতুম, পরিশ্রমের কাজকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করতুম, এবার আমার ভুল ভেঙেচে।

অকৃত্রিম আনন্দে অমলার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কথা বলিতে পারিল না, আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। স্বামীর বর্তমান অভিমত যে লঘু ও ভাসা ভাসা নয়, তাহা সে হৃদয় দিয়া

অনুভব করিল। মনে মনে সে এই পরিবর্তনের জন্য পরম দেবতার নিকট সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করিল!

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জাতির জীবনে যেমন ঝড় বহিয়া গিয়াছে এই এক বৎসরে, ভবেশেরও তেমনি নবজন্ম লাভ হইয়াছে! যে আলস্য জড়তাকে সে মজ্জাগত মনে করিত, এখন আর নিজের জীবনে সে তাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পায় না। শ্রমের মর্যাদাবোধ তাহার জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কোন কাজকেই সে ছোট মনে করে না। দাদাবাবুকে কাজ করিতে দেখিয়া শিবুও প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল। এখন আর সেও বিস্মিত হয় না। পাড়ার আরও কয়েকজন যুবক তাহাদের দলে জুটিয়াছে। গ্রামের অপরিষ্কৃত রাস্তা-ঘাট তাহারা নিজ হাতে পরিষ্কার করে। দরিদ্র রোগীদের ঔষধ ও পথ্য জোগায়, আবশ্যক হইলে সেবা শুশ্রূষা করে, ঘর ভাঙিয়া গেলে, গৃহ সংস্কার করিয়া দেয়। ভবেশের বৈঠকখানায় অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিরাও এখানে আসিয়া শিক্ষালাভ করে।

ইতিহাস, ভুগোল, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে সকলকে দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। সংসার, সমাজ ও দেশের কল্যাণে প্রত্যহ সাধ্যমত কাজ না করিয়া অন্ন গ্রহণ করাটা যে পাপ, ইহা সকলকে বুঝাইয়া বলা হয়। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করার ভাবটা যে বিকৃত বুদ্ধি হইতে আসিয়াছে, ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যেকটি মানুষকে ভালবাসিয়া ও কাছে টানিয়া লইয়া এই পাপ যে সমূলে উৎপাটন করা দরকার, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এই কল্যাণব্রতী দলটি ধীরে ধীরে এমনভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে যে, বিরুদ্ধ-পক্ষ প্রতিপদে বাধা দিয়া এবং কঠোর

সমালোচনা করিয়াও ইহাদিগকে যুথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ক্রমশই যেন এই দলটি শক্তি ও প্রসার লাভ করিতেছে।

অমলা এই দলের মধ্যমণি। তাহার পবিত্র স্নেহ, অম্লান চরিত্র এবং বিরামহীন কর্মপ্রচেষ্টা এই দলটিকে দৃঢ়-সংবদ্ধ ও সবল করিয়া রাখিয়াছে। অমলার সম্বন্ধে বহু বিদ্রূপ-কটাক্ষ ও কটূক্তি ভবেশ ও অমলাকে সহিতে হইয়াছে। তাহারা গ্রাহ্য করে নাই, এক মনে নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া চলিয়াছে। ভবেশ বলে, অমু, তোমার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে আমি নবজন্ম লাভ করেছি!

আনন্দে গর্বে অমলার বুক ভরিয়া ওঠে!

দুর্গাচরণ

আমি একখানা মাসিক পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক। বেতন বলে যা পাই, তাতে আমার আপনার বলতে সংসারে আর কেউ নেই বলেই কোনোমতে চলে যায়। নিত্য যে সমস্ত রচনা অফিসে এসে হাজির হয়, সেগুলোর সংগে থাকে প্রায়ই রচনার লেখক কিংবা একখানি অনুরোধ-ভরা চিঠি। অবশ্য প্রত্যেকটি লোকের অথবা প্রত্যেকখানি পত্রের অনুরোধ রক্ষা করতে হলে কবে আমাদের কাগজের সম্পাদকত্ব ছেড়ে হ্যাণ্ডনোট কাটতে হত।

একদিন অফিসে বসে একটা গল্পের প্রুফ দেখছি, এমন সময় আমার ছেলে বেলার বন্ধু দুর্গাচরণ এসে হাজির হল। পরনে একখানা আড়ময়লা ধুতি ও একটা ছিটের. হাফসার্ট। কয়েকদিন কামানো হয়নি বলে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে মুখখানা বিশ্রী হয়ে উঠেচে। আমি অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে আছি দেখে সে বলল: চিনতে পারলে না আমাকে? আমি দুর্গা।

আমি বললাম: চিনতে তোমায় পেরেছি, কিন্তু এখানে যে হঠাৎ? কবে এলে?

—আজই, এইমাত্র; খিদেয় পেট জলচে, এখন কিছু পয়সা দাও দিকিন্, খাবার খেয়ে আসি, তারপর কথা হবে।

বলে সে আমার সামনে হাত পাতল। লজ্জা সংকোচের কোনো বালাই নেই!

অফিসের লোকেরা হাঁ করে আমার এই নবাগত বন্ধুটির পানে চেয়ে আছে দেখে নিজেই লজ্জিত হলাম। বিস্মিত হয়ে বললাম: চলো, আমিও বাইরে যাচ্চি—বলে সেদিনের মতো অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেরুলাম।

ছোট বেলায় দুর্গাচরণের সংগে আমারই বন্ধুত্ব সব চেয়ে বেশি ছিল। পাঠ্য জীবনটা আমরা অনেক সময় এক সংগেই কাটিয়েচি। দুর্গার মা আমাকে ছেলের মত ভালবাসতেন। কোনো বিশেষ খাবার জিনিস তৈরী করলে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে কোনো দিন ভুলতেন না। অনেক রাত্রি দুর্গার পাশে শুয়ে গল্প করতে করতে কাটিয়ে দিয়েচি। দুর্গার মায়ের স্নেহ-যত্নে কোনো দিন তাদের বাড়ীকে পরের বাড়ী বলে মনে হয়নি।

তারপর দুর্গার মা মারা গেলেন। আমাদের আনন্দ-চাঞ্চল্যও ঘুচে গেল। দুর্গা বিবাহযোগ্য হয়ে উঠলেও তার বাবা তার বিয়ে না দিয়ে নিজেই একটি বিয়ে করে বসলেন। সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে, এ বিয়েতেও তার ব্যতিক্রম হল না। দুর্গার বিমাতা এসে তাকে বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন এবং সন্তানের জন্যে পিতৃহৃদয়ে যেটুকু স্নেহ অবশিষ্ট ছিল, তাও রূপান্তরিত করে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিলেন। দুর্গার বয়স হয়েছিল, সে পিতার এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হল। দুর্গার মাতা-মহের দেওয়া তার মায়ের গহনাগুলো নিয়ে যখন পিতা নূতন মাকে সাজালেন, তখন সে রাগে জ্ঞানহারা হল, এবং গহনাগুলো দাবী করলো। বিমাতার পরামর্শে পিতা তাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।

দুর্গা কয়েকদিন চুপ করে রইল, তারপর একদিন রাত্রে বিমাতার বাক্স থেকে গহনাগুলো নিয়ে চম্পট দিল। তারপর থেকে পিতামাতা আর এই গুণ্ডা বদমায়েসটার নামও মুখে আনেন না। যে ছেলে মায়ের গহনা চুরি করতে পারে, তেমন পাষণ্ড বেঁচে থাকলেই বা কি আর মরলেই বা কি? বরং মরলে হাড়ে বাতাস লাগে!

দুর্গা দূরবর্ত্তী গ্রামে একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে বাস করতে লাগল। সেইখানে সে একটা নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকেই জীবন-সঙ্গিনীর পদে অভিষিক্ত করল। যে শুনল, সেই দুর্গার অপকীর্তিতে

শিউরে উঠল! কারণ, যে ভদ্র-সন্তান মাথা হেঁট না করে প্রকাশ্যে এরকম কলংকময় জীবন যাপন করতে পারে, তাকে ধিক্কার দেবার আর ভাষা আছে কি? কিন্তু দুর্গা নির্বিকার! সে মায়ের গহনা চুরি করতেও যেমন সংকুচিত হয়নি, এখনও তেমনি সামাজিক মানুষের তীব্র ধিক্কার-পূর্ণ আলোচনা সত্ত্বেও কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করল না।

আমি প্রিয়তম বন্ধুর এই অধঃপতনে মর্মান্তিক দুঃখিত হলাম এবং কি করে যে আবার তাকে স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারব, তাই ভাবতে ভাবতে তার নূতন বাসস্থানে গেলাম। সে আমাকে খুব আনন্দের সংগে অভ্যর্থনা করল। সে যে কোন অপকর্ম করেচে, তার ব্যবহারে তার লেশমাত্রও প্রকাশ পেল না। আমি বন্ধুর এই লজ্জা-হীনতায় মর্মাহত হলাম। তবে বুঝি তার হৃদয় থেকে সমস্ত সৎ বৃত্তি নিঃশেষে মুছে গেচে। যার চরম অধঃপতন ঘটেচে, বন্ধুর একান্ত অনুরোধেও যে তার কোন পরিবর্তন হবে না, এটুকু আমি তাকে দেখেই বুঝলাম। তবুও একেবারে আশা ছাড়তে পারলাম না।

দুর্গাচরণের আহ্বানে তার বাড়ীতে ঢোকবার মুখে দেখলাম, একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বাইরের দিকে আসচে। আমাদের দেখেই সে লজ্জিত হয়ে মুখের ওপর ঘোমটা টেনে দিল। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, কে এই মেয়েটি! পরমুহূর্তে দুর্গার কথায় তার পরিচয় পেলাম।

সে বলল: ওগো, রমেশকে দেখে অত লজ্জা করতে হবে না, ও আমার ছেলেবেলার সেরা বন্ধু। এখন বাইরে কোথাও যেও না, আমার বন্ধুর খাতির কর।

এই সেই নীচ-জাতীয়া মেয়েটি? কিন্তু এর সম্ভ্রম দেখে একে তো ভদ্রঘরের বলেই মনে হয়? তবে কি লোকে বিদ্বেষ বশতঃ এরকম কথা প্রচার করেচে? সে দুর্গার কথা মত ফিরে চলল। আমি কিছুতেই

এই মেয়েটির সম্ভ্রমে আঘাত দিয়ে কথা বলতে পারলাম না। বললাম: উনি হয়ত কোনো দরকারে বাইরে যাচ্ছেন, ওঁকে যেতে দাও।

মেয়েটি নিম্নস্বরে বলল: না না, আসুন আপনারা, আমার পরে বাইরে গেলেও চলবে।

ভিতরে গিয়ে আমাদের বসবার জন্যে সযত্নে একটি মাদুর বিছিয়ে বসতে বলল। আমরা বসলে বলল: আপনারা দু-বন্ধুতে ততক্ষণ কথা বলুন, আমি ওঘর থেকে চা করে নিয়ে আসচি।

এতে যে কারুর কোনো আপত্তি থাকতে পারে—তেমন কোনো চিন্তাকে আমল না দিয়েই সে যেন বন্ধু-পত্নীর উপযুক্ত মর্যাদা নিয়েই ধীর পদক্ষেপে চলে গেল।

দুর্গা বোধ করি আমার দ্বিধা সংকুচিত অন্তরের কথা বুঝতে পেরেছিল। তাই বলল: তুমি আপত্তি করলে না রমেশ? ওঁর হাতের তৈরী চা খাবে ত?

আগের থেকে ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে আমার মনে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল, তাতে ওর হাতে চা অথবা কোনো খাবার খেতে আমার আপত্তি হওয়ার কথা; কিন্তু আমার আপত্তিটা যে বন্ধু এবং ঐ মেয়েটির অন্তরে কতখানি আঘাত হানবে, তা বুঝেই সে কথা উচ্চারণ করতে পারলাম না। বললাম: খাব বৈকি, চা খেতে কি আপত্তি?

—আপত্তির অনেক কারণ থাকতে পারে, তুমি কি ওঁর সম্বন্ধে কিছুই শোননি?

—শুনেচি অনেক কথা, কিন্তু সে সব কি সত্যি?

—তা জানি না, মানুষের বিচার বুদ্ধির সংগে আমার বিচার-পদ্ধতি মেলে না, তাই ও কথার উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করব না। মানুষকে যারা ছোট করে দেখে, নিজের প্রয়োজন ছাড়া অপরের প্রয়োজনের গুরুত্ব যারা স্বীকার করে না, তাদের কাছে আমার বলবার কিছুই নেই।

আমি বললাম: প্রয়োজনই কি সব? এযে তুমি কার্লমার্কসের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার মত প্রয়োজনের আওতায় ফেলে সব কিছুর বিচার করচ!

দুর্গাচরণ জোর দিয়ে বলল: হ্যাঁ তাই, জগতের যা-কিছু, সব প্রয়োজনের খাতিরেই, একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা মোটেই কঠিন নয়। শিক্ষা বল, সভ্যতা বল, রাষ্ট্রগঠন বল—সবেরই মূলে আছে প্রয়োজন। বাবা যে উপযুক্ত ছেলের বিয়ে না দিয়ে নিজে বিয়ে করে বসলেন, সেটা প্রয়োজন বশতঃই। আমি তাঁর কাছে আমার মায়ের গহনা চাইলাম, তিনি দিলেন না বলে আমাকে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ অবলম্বন করতে হল, সেও আমার প্রয়োজনের তাগিদে। অথচ বাবার ব্যবহারকে তোমরা সংগত বলে মেনে নিলে আর আমার আচরণটাকে অসংগত বলে ঘৃণায় নাক সিটকোলে!

আমি বললাম: জগতে প্রয়োজনটাকেই যদি এত বড় করে দেখা যায়, তা হলে তো আর আইন-কানুন রীতি নীতির কোনো মানে থাকে না, একটা ঘোর উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়ে মানুষের শিক্ষা, সভ্যতা ঐতিহ্য—সব কিছুকে ভাসিয়ে দিতে পারে?

দুর্গা বলল: আমার কথাটা তুমি গভীর ভাবে ভেবে দেখনি, তা হলে আর ওরকম ভাসা-ভাসা প্রতিবাদ করতে না। পরিশ্রমের পর যেমন বিশ্রাম দরকার, গতির মধ্যে যেমন সংযম আবশ্যক, প্রয়োজন-বোধের মধ্যেও তেমনি সংযমের আবশ্যকতা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এও ঠিক যে, উদারতা এবং সহানুভূতি না থাকলে এর সীমা নির্দেশ করা চলে না।

আমি এ প্রসংগ ত্যাগ করে নূতন প্রসংগের অবতারণা করলাম: তুমি কোনো ভদ্র ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে পারতে তো, তাতে তো তোমাকে সমাজের কাছে ছোট হতে হত না?

দুর্গা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল: ভদ্র অভদ্র কাকে বলো তোমরা? যার ভদ্রতা আছে তাকে, না যে তথাকথিত ভদ্র?

আমি এ কথার উত্তর দিলাম না। আমার উত্তর না পেয়ে দুর্গা বলল: জেনে রেখো, আমি যাঁকে সহধর্মিনী বলে স্বীকার করে নিয়েচি, তিনি আচার-আচরণে শিক্ষা-সভ্যতায় কারুর চেয়ে হীন নন!

তার কথার প্রতিবাদ করবার মত যুক্তি নিজের ভিতরে খুঁজে পেলাম না, তাই চুপ করে রইলাম। কিন্তু তার কথাগুলো স্বীকার করে নিতেও কোথায় যেন বাধছিল। সেদিন দ্বিধা-জড়িত চিত্তে বন্ধুর বাড়ীতে চা ও জলখাবার খেয়ে এবং আরও কিছুক্ষণ কথা বলে বিদায় নিয়ে এলাম। যে জন্যে গিয়েছিলাম, তার কিছুই করতে পারিনি।

সে ঘটনার পর দীর্ঘ দশ বৎসর আর তার সংগে দেখা হয়নি, আজ আবার দেখা হল। আগে সে খুব সৌখীন ছিল, তার প্রসাধন-পারিপাট্য ছিল দেখবার মত বস্তু। কিন্তু আজকের চেহারার সংগে তার গত জীবনের তুলনাই হয় না। বললাম: খবর সব ভাল ত?

সে ম্লান হেসে বলল: তোমাদের পক্ষে ভাল, কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

—তার মানে?

—তার মানে তোমরা যে মেয়েটিকে আন্তরিক ঘৃণা করতে, তিনি তোমাদের পুঞ্জীভূত ঘৃণার পশরা মাথায় নিয়ে পরলোক গমন করেচেন। —বলে দুর্গা হাসল, সে হাসি অশ্রুরই নামান্তর! প্রকাশ্যে তাকে সমবেদনা জানাতে পারলাম না, কিন্তু তার জন্যে অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করলাম! সেই পরলোকগতা মেয়েটি বন্ধুর জীবনের সমস্ত আনন্দ মুছে নিয়ে গেচে, তার জন্যে রেখে গেচে শুধু বেদনাময় স্মৃতি!

অ-পরাজিতা

আজ কয়েক দিন ধরেই সমানে বৃষ্টি হচ্চে। আষাঢ়ের বৃষ্টি-স্নাত ধরণীর সর্বত্র প্রকৃতির অপূর্ব শ্যামলিমা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পুরো দু মাস আদৌ বৃষ্টি হয়নি। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাপটে মানুষের প্রাণ যেন যাই যাই করছিল। কাজ-কর্ম, লেখা-পড়া, অফিস-আদালত—সর্বত্রই গুমট, সব সময়েই অস্বস্তি! তাই এ বছরের প্রথম বৃষ্টিকে সানন্দে মানুষ বরণ করে নিয়েছিল। কিন্তু এ কি? বৃষ্টিও যদি গ্রীষ্মের সংগে তাল রেখে এক-টানা দীর্ঘ-দিন ধরে চলতে থাকে, তাহলেই বা মানুষের চলে কি করে? কাঠ-ফাটা রোদে ত আর ধানের বীজ বপন করা কিংবা পাটের চারা তৈরী করার সুবিধে হয়নি? সেটা আবশ্যকমত বৃষ্টি হওয়ার পরই চাষীরা করেচে! কিন্তু এত বেশি বৃষ্টি হলে সেগুলিকে তারা বাঁচাবে কেমন করে? চাষীদের সারা বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাত-কাপড়, দেনা-পাওনা, রাজা-মহাজন, লোক-লৌকিকতা, বাজার-হাট, কেনা-কাটা —সবই যে চাষের সফলতার ওপর নির্ভর করচে? ফসল না হলে ওরা যে অভাবের তাড়নায় কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, তাই বা কে বলতে পারে? চাষীদের মত বহু নিম্ন-মধ্যবিত্তেরও চাষই একমাত্র অবলম্বন। তাই সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েচে। কারুরই মনে সুখ এবং সোয়াস্তি নেই, হাসি দেখা যায় না আর তেমন করে কারুর মুখে। সকলেই বিষণ্ণ, কথাবার্তার মধ্যে সকলেরই কেমন একটা বিষাদ মাখানো সুর!

ও পাড়ায় ঘোষেদের বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা জমে আজও, কিন্তু পূর্বের সেই উৎসাহ-দীপ্তি, বাজী জিতলে সচিৎকার আনন্দ প্রকাশ—কিছুই নেই। দু এক বাজী খেলার পরই আর ভাল লাগে না কারও। মুখুজ্যেরা এ পাড়ায় মাস ছয়েক হল একটা রেডিও কিনেচে। কী ভীড়

হত প্রথমটা ? কিন্তু এখন তার সিকি লোকও জমে না। দু একখানা গান শোনার পরই শ্রোতাদের মধ্যে কারুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে : ওটা বন্ধ করে দাও না খুড়ো……গান আর ভাল লাগচে না দাদা…

এমনি দিনে তিনু ঘোষের মেয়ে পাঁচী স্বামী-গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে তার বিধবা মায়ের কাছে ফিরে এলো। মা তো তার ধান ভেনে, পরের সংসারে কাজ-কর্ম করে কোন প্রকারে সংসার চালাতো। সহসা মেয়েকে দেখে এবং তার সমস্ত দুর্ভাগ্যের ইতিহাস শুনে চোখে অন্ধকার দেখলে সে। সুশ্রী মেয়ে, ভরা যৌবনের হিল্লোল বয়ে যাচ্চে তার সর্বাংগে, সহরে বিয়ে হয়েছিল বলে চাল-চলন কথাবার্তা সবই তার সহরের মেয়েদের মত। তিনুর মেয়েকে দেখে চেনবারই উপায় নেই। পাড়ার লোকের তাক্ লেগে গেল পাঁচীকে দেখে। কিন্তু তার বিধবা মায়ের মাথায় যেন বজ্রপতন হল! এখন এই আগুনের শিখার মত মেয়েকে নিয়ে কীই বা করবে সে ? আর কীই বা খাওয়াবে তাকে ?

পাঁচির দুর্ভাগ্যের ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি অদ্ভুত! হিন্দু ঘরের মেয়ে সে, স্বামীকে দেবতার মত করে দেখতে না পারুক, দানবের মতও মনে করত না। সেবা-যত্নও করে যেত যতদূর সম্ভব। সারাদিনের সাংসারিক কাজ-কর্ম এবং নিরবসর পরিশ্রমের পর ওরই মধ্যে নিজেকে কিছুটা সজ্জিত করে নিয়ে দেবতার কাছে নৈবেদ্য ধরে দেওয়ার মত স্বামীর শয্যাপার্শ্বে নিজেকে সমর্পণ করত। কিন্তু স্বামী তার পূজা-উপচার গ্রহণ করত না; পাড়ার একটি বিধবা বৈষ্ণবীর প্রেমে মুগ্ধ হয়েছিল সে অনেক আগে থেকেই। মোটর ড্রাইভারী করে যা কিছু রোজগার করত সে, তার বেশির ভাগই দিত বৈষ্ণবীর সেবায়। অবশিষ্ট অংশ নিজের জামা কাপড়, প্রসাধনের জিনিষ এবং মদ কিনতেই খরচ হয়ে যেত। একান্নবর্তী সংসারে ছিল বলেই পাঁচী খেতে পরতে পেত। সে একদিন বলেছিল স্বামীকে : আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন না হয়

বাইরে যেতে। কিন্তু এবার ত আমি বড় হয়েচি, আর কি তোমার যেখানে সেখানে যাওয়া সাজে? তুমি কি আমার পানে কোনদিনই চাইবে না?

স্বামী সংগে সংগেই তার উত্তর দিয়েছিল স্ত্রীর সর্বাংগে বেশ কিছুক্ষণ নিষ্ঠুর ভাবে চাবুক চালিয়ে। পাঁচির শরীরের অনেক জায়গাই কেটে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল প্রহারের চোটে। শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে।

প্রায়ই মার খেত স্বামীর হাতে; অপমান অত্যাচার এবং নিষ্ঠুর পীড়নও সহ্য করেচে সে অনেক, কিন্তু এবারের মারের তুলনায় সে সব কিছুই নয়। এবারে তার সহন-শক্তিও পরাভূত হল; জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে অত্যাচারী স্বামীর পায়ের কাছে।

তারপর সে বিতাড়িত হয়েচে বিধবা সহায়-সম্পদহীনা মায়ের কাছে।

পাড়ার ছেলেরা ত সহসা অত্যন্ত পরোপকারী হয়ে উঠল! বয়স্ক মাতব্বররাও তাঁদের উপদেশের ঝুলি নিয়ে একে একে দেখা দিতে লাগলেন পাঁচির মায়ের বাড়ীতে। এরা যে সত্যিই এমন পরদুঃখকাতর এবং সহানুভূতিশীল, পাঁচী আসবার আগে পাঁচীর মা সে কথা কোনদিনই বোঝেনি। সে নিজেকে প্রথমটা যত বিপন্ন মনে করেছিল, এখন এদের সহানুভূতি দেখে এবং মিষ্টি কথা শুনে অনেকটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পাঁচির দুঃখের কাহিনী তার মার মুখে শুনে সকলেই প্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠে পরামর্শ দেয়, 'ও রকম ইতরের কাছে পাঁচিকে না পাঠানোই উচিত। আমরা রয়েচি, পাঁচির খাওয়া-পরার ভাবনা কি? একটা কিছু ব্যবস্থা আমরা করবই।'

পাঁচি কিন্তু গৃহস্থালির কাজকর্ম নিয়েই থাকত, সে কারুর সংগে গল্প গুজব কিংবা ঘনিষ্টতা করার চেষ্টা করত না বা করতে চাইত

না। ক্রমশই হিতকামীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগল। তাদের আসাও বন্ধ হয়ে গেল।

বাস্তুভিটার সংলগ্ন যে সামান্য পতিত জমিটুকু ছিল, পাঁচি তাতে নানারকম তরিতরকারীর আবাদ করল। তার যা যৎসামান্য সোনার গহনা ছিল, সেগুলি বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করল। এই টাকা থেকে সে একটা ঢেঁকি এবং কয়েক মন ধান কিনল। এই ধান সিদ্ধ শুকনো করে এবং মা-মেয়েতে ভেনে চাল তৈরী করে বিক্রি করতে লাগল। এতে তাদের দুজনের পরমুখাপেক্ষি না হয়ে এক রকম করে চলে যেতে লাগল। একটি মুহূর্তও সে অলস ভাবে কাটায় না। অনর্থক সে একটা পয়সাও খরচ করে না। সব রকম বিলাসীতা সে ত্যাগ করল। ফলে কারুর কাছেই তার কৃপাপ্রার্থী হওয়ার বা হাত পাতার আবশ্যক হল না। এ দেখে হিংসায় বিদ্বেষে অনেকেরই মন ভরে গেল। কি ভাবে তাদের বিপদে ফেলা যায়, সে চেষ্টা অনেকেই করতে লাগল।

যারা পাঁচিদের কাছে চাল কিনতে আসত, তাদের কাছে ওদের সম্বন্ধে নানা অপপ্রচার চলতে লাগল। এই অপপ্রচারের ফলে ওদের স্বাবলম্বনের সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হল। খুবই বিপদে পড়ল ওরা। ক্রমশ মূলধন পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল। গাঁয়ের মানুষগুলির মনের চেহারা দেখে পাঁচি অবাক হয়ে গেল। তার রূপ ও যৌবনকে পণ্য হিসেবে দেখেই প্রথমটা যারা সহানুভূতি প্রদর্শন করতে এসেছিল, তাদের সেই বিকৃত ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়ার জন্যেই যত রাগ তাদের! মানুষের চেহারায় এক একটি নারীমাংস লোলুপ রাক্ষস যেন! মুখে এরা যাই বলুক, নারীর মর্যাদা এদের কাছে কথার কথা মাত্র! পাঁচি খুব ভাল করেই বুঝেছে সেটা। সুযোগ সুবিধার অভাবে অনেকেই ভদ্রভাবে থাকে এবং মেয়েদের বিভ্রান্ত করবার মত অনেক ভাল ভাল কথা বলে! যারা এদের কথায়

ভোলে, তারাই মরে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর এঁটো পাতার মতই ছুঁড়ে ফেলে দেয় এরা।

পাঁচি এদের কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না, উপবাসে মৃত্যু-বরণ করাও এর চেয়ে ভাল তার কাছে।

কয়েকদিন পরে দে-বাবুদের বাড়ীর ঝি তার কাছে এসে বললে, বাবুদের বাড়ীতে কাজ করবে তুমি?

পাঁচি জিজ্ঞাসা করল, কতক্ষণ থাকতে হবে তাঁদের বাড়ীতে? কি রকম মাইনে দেবেন তাঁরা?

—সন্ধ্যের কিছু পরেই ওঁদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়। তারপরই বাড়ী চলে আসতে পার। খাওয়া পরা এবং পাঁচ টাকা করে মাসে মাসে পাবে তুমি। রাজী আছ কি?

পাঁচি রাজী হয়ে গেল। মৃত্যুঞ্জয় দের বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি। তাঁর স্ত্রী এবং একটি অবিবাহিত পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ছেলে, আর ঝি চাকর—এই নিয়েই তাঁর সংসার।

দে-বাবুদের বাড়ীতে মাসখানেক নিরুপদ্রবে কেটে গেল পাঁচির। একদিন সন্ধ্যের পর দে-বাবু পাঁচিকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। পাঁচি যাবার পর তিনি বললেন, আমার পাগুলো বড় কামড়াচ্ছে, একটু টিপে দিতে পারিস্ পাঁচি? অবিশ্যি যদি অসুবিধে মনে করিস্, তাহলে থাক্।

পাঁচি আর কি বলবে? সে পা টিপতে বসে গেল। দে-বাবুর মাথার কাছে আলো জ্বলছিল। পা টিপতে টিপতে পাঁচি নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেচে। সহসা ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে দে-বাবু রক্তপিপাসু বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাঁচির বুকের ওপর।

* * *

রাত তখন আটটা। আলোকোজ্জ্বল টানা বারান্দার একদিকের

একটা জানালার গরাদে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছিল পাঁচি। তার কাপড় জামা ও চুল বিপর্যস্ত। দে-বাবুর ছেলে মনোজ সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কাঁদচ কেন পাঁচি? কি হয়েচে? কেউ বকেচে তোমায়?

পাঁচির কান্না দ্বিগুণ বেড়ে গেল। পীড়াপীড়ি করাতে দে-বাবুর ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

—বুঝেচি, বাবা অপমান করেচেন তোমায়।

পাঁচি কোন কথা বলল না। তার চোখ মুখ তখনও লাল হয়ে রয়েচে। বুকের স্পন্দন তখনও দ্রুততর, কেমন একটা বিহ্বল ভাব তার। এই আলুথালু চেহারায় অপূর্ব হয়ে উঠেচে সে!

অবাক হয়ে গেল মনোজ তার পানে চেয়ে। তার মনের মধ্যেও তখন বিপ্লব সুরু হয়ে গেচে। সহসা সে বলল, পাঁচি, আমি বাবার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তুমি কি আমায় বিয়ে করতে রাজী আছ?

—আপনি বিয়ে করবেন আমাকে? আপনি কি জীবনে আমাকে শ্রদ্ধা করতে পারবেন?

—কেন পারব না? অশ্রদ্ধেয় কোন কাজই তুমি করতে পারো না— এ বিশ্বাস আমার আছে।

—পুরুষ মানুষকে আমি আর বিশ্বাস করি না মনোজবাবু! পুরুষ স্বার্থপর, পুরুষ অত্যাচারী—আমি জীবন ভরে পুরুষের এই রূপই শুধু দেখে এসেচি! আমি হয়ত আর পুরুষকে শ্রদ্ধা করতেই পারব না। তাই আপনার অনুগ্রহ আমি চাই না।

—অনুগ্রহ নয়। আমি—আমি তোমায় ভালবাসি!

—ভালবাসেন! বাঃ! বেশ! তার কণ্ঠে বিষাক্ত বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়ে উঠল। বলল, এবার আমায় পথ ছেড়ে দিন, আমি বাড়ী যাব।

—তুমি কি আমায় বিশ্বাস করচ না?

—না।

—কিছু টাকা নেবে তুমি?

—না। আর আমায় জ্বালাবেন না, দয়া করে যেতে দিন।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মনোজ বলল, আচ্ছা যাও। আমি আর জীবনে বিয়ে করব না; অবিবাহিত থেকে বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আর আমার ভালবাসার স্মৃতি বহন করব, সব সময় আমি তোমাকে আমার সাধ্যমত সাহায্য করতে প্রস্তুত রইলাম। আমার কাছ থেকে যদি তুমি সাহায্য নাও, তাহলে আমি কৃতার্থ হব!

—মনে থাকবে আপনাকে। বলে পাঁচি ধীরে ধীরে চলে গেল। তার গতিপথের পানে তাকিয়ে রইল মনোজ। এই অনমনীয় প্রকৃতির মেয়েটিকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে সে, সেই কথাই ভাবতে লাগল। সাহায্য যে তার একান্তই দরকার, এও সে ভালভাবেই জানে। কিন্তু কোন সাহায্যই হয় ত সে নেবে না।

পঞ্চাশের মন্বন্তর এলো বাঙালীর জীবনে। মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে কত নরনারী শিশু বৃদ্ধ প্রাণাহুতি দিলে। কিন্তু পাঁচিরা তখন কোথায়? জীবনের টানে কোথায় চলে গেচে তারা, কেউ জানে না। মনোজ অনেক খুঁজেচে তাদের, কিন্তু কোথাও পায়নি? গেল কোথায় তারা?

পাঁচি তাদের বাড়ী থেকে চলে যাবার পর কিছুদিন মনোজ বাড়ীতে ছিল। কেমন একটা শান্ত গম্ভীর ভাব, একা একা ঘুরে বেড়ায় যেখানে সেখানে। বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে গেলেই মন বিরূপ হয়ে ওঠে, ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বাপের মুখের দিকে চাইতে পারে না, বাপের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলতে চায় না। সংসারের ভালমন্দ সম্বন্ধে কেমন একটা উদাসীন ভাব।

এইসব ভাবগতিক দেখে দে-বাবু ঠিক করলেন, মনোজের এবার

বিয়ে দেওয়া উচিত। সময়মত বিয়ে না হওয়াতেই সংসারে আর তার টান নেই। একমাত্র সন্তান। সে যদি এই রকম হয়, তাহলে কাকে নিয়ে সংসার-ধর্ম করবেন? বিয়ে এতদিন হয়েই যেত, শুধু কিছু বেশি যৌতুকের আশায় দিন গুণছিলেন। কিন্তু আর ত অপেক্ষা করা চলে না। এত বড় বাড়ী, এত জমি-জমা, বাগান পুকুর—কী কাজে আসবে এ সব, যদি এক ছেলেই এমন উদাসীন হয়ে থাকে? ছেলের জন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, আর ত অপেক্ষা করা চলে না।

স্ত্রী মনোরমা প্রত্যুত্তরে বললেন, কিসের আর অপেক্ষা করা চলে না?

—খোকার বিয়ের। তুমি কি কিছুই ভাব না এসব নিয়ে?

মনোরমাও ভাবেন। এই মনোজের সংসারের প্রতি খুব টান ছিল। প্রজারা সকলেই মনোজের খুব প্রশংসা করে। তারা নাকি দাদাবাবুর মত এত ভাল মানুষ দেখেনি। তাঁর কত দয়া! প্রজাদের বৌ-ঝিয়ের প্রতি এতটুকু উঁচু নজর নেই তাঁর! নেশা ভাঙ্ করেন না তিনি। এমন মানুষ কি হয়? সেই ছেলে তাঁর দিন দিন সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়চে! খাওয়া দাওয়াও তার কমে গেচে। সব সময় কি যেন ভাবে। কেন এমন হল বুঝতে পারেন না তিনি। বিয়ের বয়স হয়েচে। বিয়ে দেওয়াই ভাল, আর দেরি করা উচিত নয়। কি থেকে যে কোন্ অনর্থ হয়, কে বলতে পারে! সেই তিনি নাকি ছেলের কথা ভাবেন না! তাঁর কত সাধ, কত আশা, বৌমাকে, নাতি-নাতনীকে নিয়ে আদর যত্ন করবার কত শখ, কর্তা তার কি বুঝবেন?

ঘটক ডেকে অবস্থাপন্ন ভাল ঘরের সুন্দরী মেয়ে যত শীঘ্র সম্ভব যোগাড় করবার জন্যে বলা হল। অল্প কয়েক দিনের চেষ্টায় সে রকম পাত্রীও যোগাড় হয়ে গেল। দে-বাবু মেয়ে দেখে খুব খুসী হলেন। কিন্তু মনোজ বেঁকে বসল, বিয়ে সে করবে না, কিছুতেই না। মায়ের

চোখের জল, বাপের মিঠেকড়া উপদেশ সবই ব্যর্থ হল ! বহু অনুরোধ করেও মেয়েই দেখাতে পারলেন না তাকে। মেয়ে দেখাতে পারলেও কিছুটা কাজ হত বলে দে-বাবুর ধারণা। কিন্তু তাও সম্ভব হল না। বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমার মত কুলাংগার ছেলের মুখ দর্শন করতে ইচ্ছে করি না আমি। তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যা খুসী কর। এ বাড়ীতে থেকে ওসব খেয়ালীপনা চলবে না।

—আচ্ছা, বলে মাকে প্রণাম করে মনোজ বেরিয়ে গেল।

মা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আমাকেও নিয়ে চল তবে খোকা ! তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না বাবা !

—পরে আমি তোমাকে নিয়ে যাব মা, আগে একটা আস্তানার ব্যবস্থা করি।

মাস দুই ঘুরে ঘুরে কলকাতায় একটা সংবাদপত্রের অফিসে মনোজ একটা চাকরী যোগাড় করল, মাইনে মাসে দেড়শো টাকা। পঁচিশ টাকায় একটা ছোট্ট বাড়ী ভাড়া করল। দুখানা ঘর, একটা রান্নাঘর এবং কল পায়খানা আছে। মাকে আনতে গিয়ে শুনল, মনোজের জন্যে যে মেয়েটিকে তার বাবা পাত্রী হিসাবে মনোনীত করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাকেই তিনি বিয়ে করেছেন ! সুগভীর ঘৃণা ও লজ্জায় মনোজের মা আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। দেখা হল সেই মেয়েটির সংগে অর্থাৎ তার নতুন মায়ের সংগে। সর্বংসহা ধরিত্রীর রূপ ! মনোজের পানে মুখ তুলে চাইতে পারল না সে ! মনোজ ছুটে পালিয়ে এলো বাড়ী থেকে। জগতে কি ধর্ম, নীতি, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা —কিছুই নেই, শুধুই স্বার্থপরতা ?

হাতছানি

গ্রামের মধ্য দিয়া লোক্যাল-বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার একপাশে একটা টিনের চালের পাঠশালা ঘর, অনেক দিনের পুরাণো; দরজা-জানালাগুলি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ঘরের পিছন দিকটা নানা রকমের ছোট ছোট বনগাছে ভরিয়া গিয়াছে। কয়েক প্রকারের নাম না-জানা বনফুল ফুটিয়া স্থানটাকে বেশ রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। বাকী তিন দিক চলনসই রকমের পরিষ্কার আছে। কুড়ি পঁচিশটি ছেলেমেয়ে মিলিয়া পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতেছে। ইহাদের দুই একটির ছাড়া আর কাহারও পরিচয় নিমাই জানে না।

নিমাইয়ের বয়স যখন সাত আট বৎসর, তখন যিনি শিক্ষকতা করিতেন, এখনো তিনিই অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইতি-মধ্যে সতেরো আঠারো বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। তখন যে গুরু-মহাশয়কে দেখিয়া যমের কাল্পনিক ছবি মনে পড়িয়া গিয়া নিমাইকে আতংকগ্রস্ত করিয়া তুলিত, এখন সে কথা মনে পড়ায় তাহার হাসি পাইল।

দরজার ফাঁক দিয়া পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা নিমাইকে দেখিয়া গুরুমহাশয় আদর করিয়া ডাকিলেন এবং নিজের টিনের চেয়ারখানা কোঁচার খুঁট দিয়া ঝাড়িয়া তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

সতেরো আঠারো বৎসর পূর্বেকার কথা নিমাইয়ের মনে পড়িয়া গেল। তখন যে পাঠশালায় যে গুরুমহাশয়ের সামনে নিমাই সসংকোচে ছেলেদের বসিবার আসনের একপাশে কোনমতে বসিয়া পড়িত, আজ সেই নিমাইকে সেই গুরুমহাশয় সসম্মানে তাঁহার চেয়ারে বসাইয়াছেন! কালের কি কুটিল গতি!

পাঠশালার ছুটির সময় হইয়া আসিল। পরদিনের অংক লেখা

প্রভৃতির নির্দেশ দিয়া মাষ্টার মহাশয় ছাত্রগণকে ছুটী দিলেন। তিনি যাঁহার বাড়ীর ছেলেদের গৃহে পড়াইবার বিনিময়ে আহার্য ও বাসস্থান পাইয়া থাকেন, সেই গোবর্ধনবাবু নিমাইয়ের একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। এই গ্রামেই নিমাইয়ের পৈতৃক বাস ভবন ছিল। বাসগৃহের ভগ্নস্তূপ এখন নানা জাতীয় আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে। শৈশবেই তাহার পিতামাতা মারা গিয়াছেন এবং পিতার দিক হইতে অন্য কোন আত্মীয়ও জীবিত নাই। তাই নিমাই যখন এখানে আসে, তখন গোবর্ধনবাবুর বাড়ীতেই তাহার শয়ন ভোজনের ব্যবস্থা হয়, মাষ্টার-মহাশয়ের তাহা জানা ছিল বলিয়া নিমাইকে তিনি সসম্মানে তাঁহার অনুগামী হইতে আহ্বান করিলেন।

রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে নিমাইদের বাসগৃহের ভগ্নস্তূপ নজরে পড়িল। অনেক দিনের পুরাণো কথা তাহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মমতাময়ী জননী এই বাড়ীতে চওড়া লাল পাড় সাড়ী পরিয়া হাসিমুখে গৃহকর্ম করিতেন, স্বামীপুত্র শাশুড়ীর পরিচর্যা ও খাদ্য বস্ত্রের তত্ত্বাবধান করিতেন। অসুস্থ সন্তানের সুস্থতা বিধানের ব্যাপারে শাশুড়ীর ও স্বামীর উপেক্ষা-অনাদর দেখিয়া মেয়েলোক সংগে লইয়া দূর পল্লীস্থিত ডাক্তারখানায় যাওয়ার শোনা গল্প মনে পড়িয়া গিয়া স্নেহ-ময়ী জননীর প্রতি শ্রদ্ধায় স্নেহে নিমাইয়ের অন্তর অভিষিক্ত হইয়া উঠিল! তারপর সেই জননী নিয়তির আহ্বানে সন্তানের জন্য নিদারুণ অতৃপ্তি লইয়া পরলোকের পথে যাত্রা করিলেন। পিতা আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে চেষ্টা করিলেন; নিষ্ঠুর নিয়তি এবার তাহার বাবাকে ও নূতন মাকে আপনার কোলে টানিয়া লইল; সাধের সংসার ছন্নছাড়া হইয়া গেল! সে কতকালের কথা!

রাত্রির আহারের পরে গোবর্ধনবাবুর বৈঠকখানার একটি ঘরে নিমাই ও গুরুমহাশয়ের শুইবার ব্যবস্থা হইল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত উভয়ের

মধ্যে নানারূপ আলাপ আলোচনা হইল। মাষ্টার মহাশয়ের গৃহস্থালির কথা, তাঁহার সাংসারিক অভাব অভিযোগের কথা, অবিবাহিতা ভগিনীর ভাবী বিবাহের কথা, তাঁহার পতি-রতা পত্নীর কত রকমের প্রেম-প্রীতি সেবার কথা—কত কথাই আলোচনা হইল। সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্যই না গুরুমহাশয়কে প্রেমময়ী পত্নীর সাহচর্য ছাড়িয়া এই দূর পল্লীতে অবস্থান করিতে হইতেছে! বলিতে বলিতে মাষ্টার মহাশয়ের যেন গলা ধরিয়া আসিল, স্থান-কাল-পাত্রের অসামঞ্জস্য ভুলিয়া গেলেন! নিমাই শুনিতে শুনিতে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার বর্তমান ব্যক্তিত্ব বিস্মৃতির কোলে লুক্কায়িত হইল!

কৃষ্ণপক্ষের চৈতি-রাত, অন্ধকারে আকাশের তারাগুলি হীরক খণ্ডের মত জ্বলিতেছে! খানিক দূর হইতে শিরীষ ফুলের চমৎকার মিষ্ট গন্ধ হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে। রাত্রিটা কেমন যেন মায়াময়, মানুষের মনে আত্মীয়তার ভাব জাগাইয়া তোলে! নিমাই শুইয়া শুইয়া মাষ্টার মহাশয়ের সংসার ও তাঁহার আত্মীয়-পরিজনদের কথা ভাবিতেছিল। তাঁহার মা, স্ত্রী, ভাই-বোন···কেমন তাঁহারা? যাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্যই দূরে থাকিয়া মাষ্টার মহাশয় এত কষ্ট, এত ত্যাগ-স্বীকার করিতেছেন? নিমাইয়ের পিতামাতা, ভাই বোন কেহই নাই। থাকিলে তাঁহাদের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রমে পয়সা রোজগার করিয়া, নানাভাবে তাঁহাদের সুবিধা বিধান করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতে পারিত। ভগবান্ সে সুযোগ ত তাহাকে দিলেন না!

অনেক রাত্রি পর্যন্ত নিমাইয়ের ঘুম হইল না। শেষের দিকে যতক্ষণ সে ঘুমাইল, তাহাও নানা বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়া।

সকালে চা ও জলখাবার খাইয়া নিমাই বেড়াইতে বাহির হইল। রাস্তার একপাশে একটি ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপের মধ্যে এক শিব-লিংগ রহিয়াছে। পাশের একটি অশ্বত্থগাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া

শিব-লিংগটিকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া যেন ইষ্টকাবরণের কতকটা অভাব দূর করিতেছে! তাহার শৈশবে মন্দিরটির অবস্থা এরূপ ছিল না, তখন ভালই ছিল। সে সময় তাহার বাবা এই শিব-লিংগের পূজা করিতেন। তাঁহার চন্দন-চর্চিত পূজারী মূর্তিটী এখনো নিমাইয়ের মনে পড়ে। সে কতদিন তাঁহার সহিত পূজা দেখিতে আসিয়াছে। মনে পড়ে, তাহার শিশুমনের স্বপ্ন ছিল, বড় হইয়া সেও তাহার বাবার মত সুললিত ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রে দেবতার আরাধনা করিবে। তাহার পিতামহের সযত্ন-স্থাপিত শিব-লিংগের পূজার ভার সে অপর কোন ব্রাহ্মণের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না; তাহার বাবাও পারেন নাই। সে সব যেন এই সেদিনের কথা!

এখন ত সে বড় হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে; কিন্তু কী পরিণতি ঘটিয়াছে তাহার শৈশব-স্বপ্নের? সে দিনের নীরব সাক্ষী অশ্বত্থগাছটি বাতাসে কচি কচি পাতা দোলাইয়া যেন নীরব ভাষায় কত কথাই তাহাকে নিবেদন করিতেছে! তাহার পিতা-পিতামহের আশা-আকাংক্ষা, বংশানুক্রমে দেব-আরাধনার অলিখিত সম্মতি—তাহার শৈশব-স্বপ্ন, তাহার দায়িত্বভার—সে কি চিরকাল পরের উপর চাপাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে? সে কি কোনদিন ঘর বাঁধিয়া সংসারী হইয়া এ সব কাজ নিজে করিবে না? পরলোকগত পিতা-পিতামহের অমর আত্মা কি ইহাতে তৃপ্ত হইতে পারিবে? সে তাহার ব্যক্তিগত খেয়ালের দ্বারা চালিত হইয়া বিলাস-ব্যসন লইয়াই মাতিয়া রহিয়াছে এতদিন! চিরকাল সে কি এই ভাবেই কাটাইবে? সহসা সুপ্তিভংগে সে যেন জাগিয়া উঠিল! পিতামহের যত্নস্থাপিত এই মূক-দেবতা তাঁহার পূজার ভার গ্রহণ করিবার জন্য যেন নিমাইয়ের চিত্ত সবলে আকর্ষণ করিতেছেন!

সকালের সোনালী রৌদ্রে রাস্তার মাঝে দাঁড়াইয়া সঞ্চরমান ভাবালু

দৃষ্টিতে সে শিব-লিংগ, অশ্বত্থগাছ ও মন্দিরের ভগ্ন ইষ্টক স্তূপের দিকে তাকাইতে লাগিল।

খানিকটা দূরে রাস্তার উপর দিয়া এক বৃদ্ধা লাঠির উপর ভর দিয়া চলিয়াছে, সংগে চলিয়াছে পিতলের কলসী কক্ষে লইয়া একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুন্দরী যুবতী। ইহাদের দেখিয়াই সে চিনিল। ইহারা নিমাইদের যজমান। কাছে আসিয়া মেয়েটি কলসী নামাইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। হাসিয়া বলিল, দাদা, আমায় চিনতে পারেন? আমি তীর্থ!

কত ছোটই সে এই তীর্থবাসিনীকে দেখিয়াছিল, এখন তাহার বিবাহ হইয়াছে; হয়ত দুই-একটি সন্তানেরও সে জননী। ছোট বেলায় সে এই মেয়েটির সংগে তেঁতুল বীচি লইয়া জোড়-বিজোড় খেলিয়াছিল কতদিন! এখনো মেয়েটি তাহাকে মনে করিয়া রাখিয়াছে ত!

নিমাই বলিল, হ্যাঁ, এই তো সে দিনের কথা, চিনতে পারব না কেন বোন? ছেলে বেলায় তোমার সংগে কত খেলা করেচি যে!

—আপনার এখনো মনে আছে সে সব কথা?

নিমাই বলিল, হ্যাঁ, সেই যে তেঁতুল বীচি নিয়ে জোড়-বিজোড় খেলা? সে আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তীর্থবাসিনী মিষ্ট হাসিয়া বলিল, বাঃ! কিছুই ভোলেন নি তো দেখচি! কবে এলেন? আমাদের বাড়ীতে যাননি ত? চলুন! দিদিমা, এঁকে চিনতে পারচ? ইনি আমাদের বামুন-দাদা।

বৃদ্ধা বলিল, বুড়ো হয়ে গেচি, আর তেমন চোখের জোর নেই ভাই! কবে এলে? ভাল আছ তো? চল, বাড়ীতে চল।

—আমি ভালই আছি। তোমাদের খবর সব ভাল তো?

—আর ভাই, আমাদের আর ভাল থাকা! মরি নি, বেঁচে আছি। তোমরা ভাল থাকলেই ভাল।

মেয়েটি এতক্ষণ এক দৃষ্টিতে নিমাইকে দেখিতেছিল। হঠাৎ নিমাই তাহার দিকে চোখ ফিরাইতেই সে সলজ্জ-হাসিয়া মাথা নিচু করিল। একটু পরে বলিল, আসুন না দাদা, আমাদের বাড়ীতে। বৌদি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করা হয় নি, ভাল আছেন তো তিনি?

নিমাই মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার এখনো বিয়ে হয়নি তো।

—ও, তা আমি জানতুম না। আসুন দাদা বাড়ীতে। বলিয়া বৃদ্ধাকে সে বাড়ীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া অগ্রসর হইল।

নিমাই বলিল, জল আনতে যাচ্ছিলে তো? জল নিয়ে এসো না, আমি দাঁড়াচ্চি।

—না, না, সে পরে হবে এখন; আসুন।

নিমাই তাহাদের অনুবর্তী হইল।

তীর্থদের আর আগেকার মত গৃহশ্রী নাই। পূর্বে সমারোহের সহিত তাহাদের বাড়ীতে বাসন্তী পূজা হইত, এখনো প্রতিমার খড়ের মেড়টা একপাশে অযত্ন-রক্ষিত থাকিয়া ইহাদের অতীত ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য দিতেছে। জায়গায় জায়গায় বাড়ীর দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে, আর নূতন করিয়া সেগুলি ওঠে নাই। দেওয়ালের ফাঁক দিয়া দক্ষিণ দিকে ধূ-ধূ মাঠ দেখা যায়। কিছুদূরে পূর্ব দিকে একটি নদী-শাখা কত গ্রাম ও প্রান্তরের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিয়াছে। বর্ষার দিনে ইহারও ঐশ্বর্যের সীমা থাকিত না, উচ্ছ্বসিত জলস্রোত দুই কূল প্লাবিত করিয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া যাইত। তখনকার দিনে কত বধূ-কন্যা বৈকালে কলসী কক্ষে পানীয় জল আহরণ করিতে আসিত। সারাদিনের পর এই সময়টায় একত্র মিলিত হইয়া তাহারা কত সুখ-দুঃখের কথা কহিতে কহিতে নদীপথে গমনাগমন করিত। পল্লীসৌন্দর্যের এক প্রাণ-বিমোহনকারী শোভাযাত্রা এখন আর দেখা যায় না। টিউব-ওয়েল হইয়া বধূ-কন্যাগণের মুক্ত বাতাসে সেই বৈকালিক ভ্রমণ ও

আলাপ-আলোচনার পথ রুদ্ধ করিয়াছে। নদীর স্রোতোধারাও বুঝি তাহাদিগকে আর দেখিতে পায় না বলিয়া গভীর বিষাদে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে! প্রকৃতির সে রমণীয় মাধুর্যও যেন সেই সংগে তিরোহিত হইয়াছে! নিমাইয়ের স্মৃতি আলোড়িত করিয়া পূর্বের কত বিলুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় ছবি জাগিয়া উঠিল!

তীর্থ ব্যস্ত হইয়া ঘড়া নামাইয়া নিমাইকে সযত্নে আসন পাতিয়া দিল। প্রীতিভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, চা খান আপনি, না দাদা?

নিমাই বলিল, চা খাই বটে, কিন্তু এখন আর খাব না। একটু আগে ওঁদের ওখানে খেয়ে এসেচি।

—তবে ময়রার দোকান থেকে জলখাবার আনাই, কেমন?

—না না, ব্যস্ত হয়ো না তুমি আমার খাবার জন্যে। বরং তোমার সংগে গল্প করি।

তীর্থ বলিল, গল্প ত করবই দাদা, কতদিন পরে দেখলাম! কিন্তু গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিলেন, কিছু না খেলে আমি বেশ খুসী হতে পারচি না।

নিমাই বলিল, ঘরে মুড়ি গুড় আছে ত? তাই দাও।

—ও সব ত আছেই, বেশ পাকা মর্তমান রম্ভা আছে আর দুধ আছে।

—ওঃ, তবে ত চমৎকার হবে বোন! তাই খাব, তুমি আমার কাছে বস।

—বসচি, আগে আপনাকে খেতে দিই।

নিমাই হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, দাও।

গুড় মুড়ি দুধ রম্ভা নিমাইয়ের সামনে পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া দিয়া তীর্থ নিকটেই মাটির উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, এবার খেতে

খেতে গল্প করুন দাদা। আচ্ছা দাদা, আপনি কি আর আমাদের এখানে আসবেন না? এই খেনেই ত আপনার বাড়ী?

খাইতে খাইতে নিমাই বলিল আসতে ত খুবই ইচ্ছে হয় দিদি, কিন্তু সেখানেও বড় জড়িয়ে পড়েচি। ছোট বেলা থেকেই ত সেখানে কাটল, বন্ধু-বান্ধব সবই সেখানে। তাদের ছেড়ে আসতেও খুব কষ্ট হবে।

—তা তো হবেই, কিন্তু আমরা কি করে বিয়ের পরে সবাইকে ছেড়ে শ্বশুর বাড়ী যাই বলুন তো? আমাদের কি কষ্ট হয় না মনে করেন?

—নিশ্চয়ই হয়। তবে সেখানে তোমরা স্বামীর ভালবাসা, শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহযত্ন, দেওর ননদ বান্ধবী—সব পাও।

—আপনিও বিয়ে করে মনের মত বউ নিয়ে এখানে থাকুন না।

নিমাই বলিল, মনের মত বউ তো সব সময় মেলে না দিদি! তবে হ্যাঁ, ছেলেমেয়ে হলে এক রকম করে কাটে বটে।

—আমরাই কি মনের মত স্বামী কিংবা শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহযত্ন পাই সবাই? অনেক সময় জীবন যে কত দুঃখের হয়ে ওঠে, তা যদি জানতেন? বলিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস রোধ করিল।

নিমাই বুঝিল, না জানিয়া হয়ত মেয়েটির বেদনাস্থানে আঘাত দিয়াছে, তাই সে অনুতপ্ত হইল।

সহসা একটা বিচিত্র ধরণের কোলাহল শোনা গেল। কে যেন কাহাকে চাবুক মারিয়া চলিয়াছে। সে বিনীত ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতেছে। আর একটি নারীকণ্ঠের করুণ মিনতি, আমার বাবাকে বাঁচান বাবু, বুড়ো মানুষ, মরে গেল! কে যেন সকলের গলা ছাপাইয়া বলিতেছে, মার্ মার্, মেরে ফেল্ বেটা বদমাসকে।

নিমাই খাওয়া বন্ধ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। তীর্থ ব্যাকুল হইয়া

তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নিমাই তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া ঝড়ের বেগে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখিল, একটি শিশুকে কোলে লইয়া একজন বৃদ্ধ মুসলমান দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই উপর একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান নিষ্ঠুরভাবে চাবুক মারিতেছে, শিশুটির গায়ের উপরও মাঝে মাঝে চাবুক পড়িতেছে, সে কাঁদিয়া অজ্ঞান হইবার উপক্রম! একটি বছর পনের যোলর মেয়ে নায়েববাবুর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাতর ভাবে মিনতি করিয়া বলিতেছে, আমার বাবাকে বাঁচান বাবু, বুড়ো মানুষ, মরে গেল, ছেলেটা ককিয়ে গেল বাবু, দয়া কর বাবু!

নায়েব 'গোবর্ধনবাবু বলিতেছেন, পা ছাড় হারামজাদী, খাজনা দেবে না, কিছু না, এখানে ন্যাকামো করতে এসেচে!

বুড়া বলিল, খাজনা আমি বছর বছর দিছি বাবু গোমস্তাবাবুকে। ওপরে ধম্ম আছেন, আমি মিছে কথা কইচি না বাবু।

গোমস্তা মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, ফের বেটা মিছে কথা বলচ ধম্মোপুত্তুর যুধিষ্ঠির কোথাকার! খাজনা দিইচিস্ তো দাখলে কইরে বেটা, দাখলে?

—দাখলে তো আপনি দাও নি বাবু।

—ওরে বেটা বদমাস্, আরও চাবুক লাগাও ব্যাটাকে, তবে সত্যি কথা কবুল করবে!

নিমাই গোবর্ধনবাবুর কাছে গিয়া বলিল, মারতে বারণ করুন ওকে, আমি সব কথা শুনতে চাই।

—শুনবে কি? ওই বুড়ো তোমার প্রজা; তুমি তো তোমার জমি-জমা দেখাশুনোর ভার আমার ওপর দিয়ে গেলে? আমি তার পর থেকেই তোমার খাজনা-পত্র আদায় করচি। ওরা পনের ষোল ঘর প্রজা তোমার নিষ্কর জমিতে বাস করে। এ বেটার ধারণা, নিষ্কর

জমির আবার খাজনা কি? তাই ও খাজনা দিতে চায় না, আবার ধম্মো দেখায়! বেটা মিটমিটে সয়তান!

মেয়েটি গোবর্ধনবাবুর পা ছাড়িয়া নিমাইয়ের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিল, আমি নিজে দেখেচি বাবু, বাবা গোমস্তাবাবুকে খাজনা দিয়েচে। দাখলে চাইতে উনি বললেন, দাখলের আর কি দরকার? আমরা কি দুবার করে খাজনা নোবো? এখন আবার দেখুন, দরোয়ান দিয়ে ধরে আনিয়ে মারধোর করচে।

নিমাই বলিল, আচ্ছা, বুঝেচি আমি তোমাদের কথা। তোমরা এখন বাড়ী যাও, পরে সব ব্যবস্থা করব।

দারোয়ান ব্যাপার দেখিয়া মার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। উহাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া নিমাই বলিল, কিন্তু অমন মারা উচিত হয় নি তা বলে, কাজটা খুবই বে-আইনি হয়েচে!

—তাহলেই তুমি জমি-জমা রাখবে নিমাই! অত নরম মন হলে আর অত ভয় থাকলে বিষয় রাখা যায় না। যাক্, তুমি যা ভাল বোঝো কর। কিন্তু আমাদের কাজে যখন বাধা দিয়েচ, তখন আমি আর তোমার বিষয় আশয় দেখাশুনো করতে পারব না। ভারি অপমান বোধ করেচি এতে আমি।

নিমাই বলিল, আচ্ছা, এবার থেকে আমিই আমার বিষয় আশয় দেখাশুনো করব। এইখেনেই না হয় থাকব এবার থেকে। বলিয়া খুব বিরক্ত ভাবেই তীর্থদের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। এই অঞ্চলে লোকজনের বসতি কম, কাছে স্কুল, পোষ্ট-অফিস, রেল-ষ্টেশন বা লাইব্রেরী নাই, শিক্ষিত লোকজনও নাই, তাই অবাধে এখানে অন্যায়ের রাজত্ব চলিতেছে। শিক্ষার অভাবে অসুরের মত শক্তিশালী মানুষও শক্তিহীন, কেমন যেন ভয়-ভীত! সে ঠিক করিল, এইখানেই তাহাকে থাকিতে হইবে, ইহাই তাহার পক্ষে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র!

দুঃখ নিশার শেষে

১

ক্ষেত্রমোহন ঘোষ দীর্ঘ দশ বৎসর পাটের ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন। গ্রামে তাঁর সমকক্ষ ধনী আর একজনও নেই। মস্ত বড় কোঠা বাড়ী, অনেক জমি জমা, বিস্তর পুকুর ও বাগান তাঁর। তাঁর বাবা দরিদ্র ছিলেন বলে তাঁকে তেমন লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি। এ আফশোষ তিনি আজও মাঝে মাঝে করেন। বিদ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর খুবই ছিল, কিন্তু অল্প বয়সে ঘাড়ে সংসারের ভার পড়ায় সে আশা সফল হয় নি। প্রচুর অর্থোপার্জন করেছেন জীবনে, ভাল ঘরে বিয়েও হয়েছিল তাঁর, স্ত্রীর ভালবাসায় এই পরিণত বয়সেও তাঁর জীবন উৎসবমুখর হয়ে আছে; দুই পুত্র ও এক কন্যার পিতা তিনি। তবুও তাঁর নিজের শিক্ষার অভাবটা মাঝে মাঝে বড় তীব্র হয়ে ওঠে। বই কাগজ অবশ্য নিয়মিত ভাবেই পড়েন। কিন্তু তাতে কি? সাধারণ জ্ঞান তাঁর বেশ প্রখর, অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসাও তিনি খুব সহজেই করে দিতে পারেন। অনেকে এজন্যে তাঁকে ডাকে-হাঁকে এবং যথেষ্ট সম্মানও করে। কিন্তু কিছুতেই মন ভরে না।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্মলেন্দু। বছর পাঁচেক হল এম-এ পরীক্ষায় পাশ করে একটি নাম করা বৃটিশ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছে। বেতন মাসে আটশো টাকা। ছোট ছেলে অমলেন্দুর মনটা প্রথম থেকেই চাকরীর প্রতি বিমুখ; ছোট বেলাতেই কেমন করে যেন স্বামী বিবেকানন্দের 'চাকরী না গুখুরি' কথাটা তার মাথার মধ্যে ঢুকে শিকড় গেড়েছিল। তাই বি-এ পাশ করে বাপের ব্যবসায়ে কিছুদিন হল সে শিক্ষানবিশী করছে। ক্ষেত্রবাবুর সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান

কন্যা মণিকা বাড়ীতে পড়ে। সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। মণিকা বেশ কাজের মেয়ে এবং মিষ্টি ব্যবহার তার। সে বাপ মা এবং ভাইদের নয়নের মণি! সবাই তাকে ভালবাসে।

সমবয়সী নির্মলেন্দুর স্ত্রী আভা ও মণিকার মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। অসংকোচে দুজনে দুজনকে মনের কথা বলে, নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনাও করে।

অমলেন্দুর এক বন্ধু মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন তাদের বাড়ীতে। এ বাড়ীর সকলের সংগেই তাঁর আলাপ পরিচয় হয়েছে। মণিকার সংগেও তিনি পরিচিত হয়েছেন। তিনি এলে প্রায়ই মণিকাকে তার দাদা অমলেন্দু আহ্বান করে, চা জলখাবার বা পান দিয়ে যেতে। মানুষটি বেশ চমৎকার ধরণের, শান্ত এবং সংযত প্রকৃতির। তাঁর উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোন প্রকার চপলতা নেই, মার্জিত রুচির এবং উন্নত স্বভাবের মানুষ। মণিকার খুবই ভাল লাগে এই ইন্দুভূষণবাবুকে। প্রায়ই তাঁর কথা মনে হয়, অনেক দিন না দেখলে তাঁকে দেখবার জন্যে মনটাও কেমন যেন বড্ড বেশী উৎসুক হয়ে ওঠে মণিকার। ইন্দুবাবুর প্রতি অদ্ভুত ধরণের আকর্ষণ অনুভব করে সে। তাঁর গলার স্বর শুনলে যে কোন কাজেই ব্যস্ত থাকুক সে, ছুটে আসবেই। আবেগকম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করবে, ভাল আছেন ত? আপনি আর আসেন না যে আমাদের বাড়ী? খুব কাজে ব্যস্ত আছেন বুঝি?

ইন্দুবাবু উত্তর দেন, আসি ত, বোধ হয় চার পাঁচ দিন আসিনি। কাজের চাপ ছিল।

—চার পাঁচ দিন মোটে? আজ সাত দিন হল! আমরা কিন্তু প্রতিদিনই আপনাকে আশা করি! গভীর প্রীতি ঝরে যেন মণিকার কথায়!

ইন্দুবাবু সহসা তার মুখের পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে অন্য কথা পাড়েন। মণিকা যেন নিরাশ এবং ঈষৎ ব্যথিত হয়। এ ব্যথা সম্ভবত অনুভব করেন ইন্দুবাবু। কিন্তু আশানুরূপ উত্তর কোন দিনই দেন না অথবা দিতে পারেন না।

মণিকার এই গোপন বেদনার এবং লুকনো ভালবাসার সংবাদ রাখে আভা! দুঃখ বোধ করে সে এই স্নেহের দুলালী ননদিনীর জন্যে। সে জানে ইন্দুভূষণ মুখুজ্যের সঙ্গে কোন দিনই এই অত্যন্ত গোঁড়া পরিবারের মেয়ে মণিকার বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারবে না, তা দুজনের ভালবাসা এবং আকর্ষণ যতই গভীর হোক! ইন্দুবাবুর তরফ থেকে হয়ত কোন বাধাই উপস্থিত হবে না, কিন্তু এ তরফের বাধা আকাশস্পর্শী! সে ভাবে, হিন্দুসমাজে কত কুসংস্কারই না প্রচলিত আছে! কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, কত ব্যবধান! এবং এর থেকে কতই না অনর্থের সৃষ্টি! প্রেম প্রীতি এবং আন্তরিক আকর্ষণের চেয়ে কতকগুলি প্রচলিত সংস্কার এবং প্রথাই এদের কাছে বড়। বিপত্নীকের পুনর্বার দার পরিগ্রহ এদের কাছে স্বাভাবিক এবং সংগত, কিন্তু বিধবার পতিগ্রহণটাকে খুব খারাপ চোখে দেখে এরা! যাদের হাড়ভাংগা পরিশ্রমে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হয় এদের, তাদেরই এরা ছোট জাত বা অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখে! এমনি এদের যুক্তিহীন বিচার! তাদের বেদনার কথা, তাদের দুঃখের কাহিনী, তাদের অসহায় অবস্থা এদের সহানুভূতি এবং সমবেদনা আকর্ষণ করতে পারে না! অথচ এরা নিজেদের সনাতন হিন্দু সমাজভুক্ত পরম ধার্মিক বলেই জানে! আভা অন্যমনস্ক হয়ে মাঝে মাঝে এ সব কথা ভাবে আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। যারা নিজেদের সৎসাহস এবং বলিষ্ঠ আচরণের দ্বারা সমাজকে সচেতন এবং ন্যায়সংগত পথে পরিচালিত করবে, তারা এমন করে অচলায়তন সমাজের মুখের পানে চেয়ে সমস্ত সদিচ্ছা এবং কামনাকে নীরবে নিঃশব্দে অন্তের

অজ্ঞাতসারে নিষ্পেষিত এবং দলিত করে চলে কেন? ইন্দুবাবুর বেদনাবিদ্ধ অন্যমনস্ক মুখের চেহারা মাঝে মাঝে যেন আভার নজরে পড়ে যায়। এমন সুন্দর উদার সাহসী মানুষ ইন্দুভূষণেরও কি হৃদয়ে দুর্বলতা আছে? মণিকাকে ভাল তিনি নিশ্চয়ই বাসেন। কিন্তু বলেন না কেন মুখ ফুটে সে কথা? দাবী করেন না কেন মণিকাকে?

একদিন আভার ঘরে মণিকা ছাড়া আর কেউ ছিল না। এই সুযোগে জিজ্ঞাসা করলে আভা,—আচ্ছা ভাই ঠাকুরঝি, তুমি কি কারুকে ভালবেসেচ? আমার কাছে সত্যি কথা বল, লুকিও না লক্ষীটি?

—কি জানি, ঠিক বুঝি না ভাই বৌদি, ভালবাসা কাকে বলে?

—ইন্দুবাবুর জন্যে মন কেমন করে না তোমার? দেখতে ইচ্ছে করে না তাঁকে?

মণিকা উদ্‌গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে বললে, করে, তিনি না এলে মাঝে মাঝে বড় মন কেমন করে বৌদি, কিন্তু এ কি দোষের?

—দোষের কথাত বলিনি ভাই। আচ্ছা তাঁকে কি বিয়ে করতে ইচ্ছে করে তোমার?

—বিয়ের কথা আমি ভেবে দেখি নি।

—তাঁর কথা ভুলে গিয়ে বাবা পছন্দ করে যাঁর সংগে বিয়ে দেবেন, তাঁকে গ্রহণ করতে পারবে ত মনে প্রাণে?

মণিকা কোন উত্তর দিতে পারলে না।

আভা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করলে, বল না ভাই, লক্ষীটি!

—কি বলব? ওঁকে আমি বোধ হয় কখনও ভুলতে পারব না!

আভা ভাবে, কিভাবে এই হৃদয়বিদারক সমস্যার সমাধান হবে?

২

সেদিন সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়ছিল। ইন্দুভূষণবাবুর মনটাও তেমন ভাল ছিল না, চুপচাপ বিছানায় পড়ে থেকে কখনও খবরের কাগজটা, কখনও বা একখানা বাংলা উপন্যাসের পাতা উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। কিন্তু কিছুই ভাল লাগছিল না বলে সেগুলো একপাশে যেন অবহেলা ভরে রাখছিলেন। হঠাৎ মনে হল, মণিকাদের ওখানে গেলে কেমন হয়? সংগে সংগে দেহ-মন দুই-ই উৎসাহিত হয়ে উঠল, ভাল না লাগার ভাবটা নিমেষে যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল! শুধু মণিকারই কথা মনে পড়ল, আর কারুর কথা ত নয়? তাঁর নিজের অগোচরে মনের মধ্যে ধীরে ধীরে যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে, এটা সহসা আবিষ্কার করে তিনি বিস্মিত হয়ে পড়লেন। লজ্জাও অনুভব করলেন! একা ঘরের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল তাঁর! মনে হল, আজকাল প্রায়ই তিনি মণিকাদের বাড়ী যান বটে, কিন্তু দরকার ত তেমন থাকে না সব সময়? সামান্য প্রয়োজনকে উপলক্ষ্য করেও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে হাজির হন তিনি! বয়স তাঁর অল্প হয়নি, কিন্তু এমন ঘটনাও ত জীবনে কোনদিন ঘটেনি? তবে কি মণিকাকে ভাল বেসেছেন তিনি? কিন্তু এ ভালবাসার পরিণাম ত শুধুই দুঃখ? ওখানে বিয়ের সম্ভাবনার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। তাঁর তরফ থেকে অবশ্য কোন বাধা নেই বটে, কিন্তু মণিকার বাবা মা যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা? তাঁরা কিছুতেই মেয়ের অসবর্ণ বিবাহ দেবেন না, তাতে যত ক্ষতিই মণিকার হোক্! সুতরাং তাঁর সংযত হওয়া দরকার নয় কি? তাঁর প্রতি মণিকার আগ্রহ তিনি বুঝতে পেরেছেন। প্রথমটা সৌজন্য বলে ভুল হত, কিন্তু এখন আর হয় না। তিনি নিজে হয়ত সহ্য করতে পারবেন, কিন্তু মণিকা ব্যথা পাবে খুব। মণিকাদের ওখানে যাওয়া উচিত কি না, এই প্রশ্নটাই শেষ পর্যন্ত খুব

বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি নিরুৎসাহ হয়ে এলিয়ে পড়েন আবার বিছানায়। সমাজবদ্ধ মানুষের মনে অনেক ভাল জিনিষের সংগে কত ভ্রান্ত কুসংস্কারই না এসেছে! কবে যে মানুষ সহজ আনন্দ এবং প্রেরণার বশে কাজ করতে পারবে, তা কে বলতে পারে? দুঃখ-নির্যাতন এবং লাঞ্ছনার অনিবার্য প্রত্যাশা নিয়েই হয়ত মানুষকে এগিয়ে চলতে হবে চিরদিন। যোগ্যতমের উদ্বর্তনই চলতে থাকবে হয়ত চিরকাল!

৩

তারপর মাসখানেক কেটে গেচে। এর মধ্যে আর মণিকাদের বাড়ীতে যাননি ইন্দুভূষণ বাবু। না যাওয়ার অবশ্য কারণও আছে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বাড়ীতে তিনি একা, তাঁর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, বন্ধুর সংখ্যাও বেশি নয়। নিজেই রান্না করে খান, কাপড়-জামা ময়লা হলে নিজেই সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নেন। অনাবশ্যক খরচপত্রও বিশেষ নেই। চা, পান, বিড়ি, সিগারেট কিংবা নস্য—কোন নেশাই নেই তাঁর, তবে কেউ অনুরোধ করলে প্রত্যাখ্যানও করেন না। মণিকাদের বাড়ীতেই বিশেষ করে এই ব্যতিক্রমটা ঘটেছে। নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী ছিলেন তিনি, কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যতটা সম্ভব কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করে এসেছেন বরাবর; দেশের কাজ করতে গিয়ে কারাবরণও করেছেন কয়েকবার। দেশের স্বাধীনতা এলো, তিনিও ধীরে ধীরে যেন কংগ্রেস থেকে সরে আসতে লাগলেন। নানা কারণে এখন আর পূর্বের মত টান নেই কংগ্রেসের প্রতি তাঁর। শ্রদ্ধেয় সহকর্মীদের সংগেও আর তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন না তিনি। তাঁরাও অবশ্য আর সে রকম ভাবে মিশতে চান না তাঁর সংগে। দেখা হলে আগেকার মত আর আগ্রহ নিয়ে কেউ তাঁর সংগে আলাপও করেন না। কেমন একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে

যেন তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে। সময় সময় এজন্যে তিনি দুঃখও অনুভব করেন খুব। তিনি কোনদিন পদ এবং মর্যাদার জন্যে লালায়িত ছিলেন না, কিন্তু এখন যেন কর্মীদের মধ্যে এজন্যে কেমন একটা অশোভন ব্যগ্রতা দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে খুবই বিস্ময় বোধ করেন তিনি এজন্যে! সত্যিকার গণসংযোগের জন্যে কোন আগ্রহও আজকাল যেন দেখা যায় না পদাধিকারী সহকর্মীদের মধ্যে। নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতেও একদিন যাঁরা প্রস্তুত ছিলেন, মানুষকে—দেশবাসী সর্বহারা জনসাধারণকে ভালবাসা, তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করাই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য এবং আদর্শ ছিল, তাঁরা যে কী করে এমন বদলে গেলেন, এটা ভাবতে অবাক লাগে তাঁর। অবশ্য ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে দেশবাসী মাত্রেই যোগদান করেনি, অনেকে খুব বিরোধীতাও করেছে, কিন্তু সে জন্যে ত কোন অভিমানই ছিল না কর্মীদের মধ্যে? আজ স্বাধীনতা আসার পর সেই দেশবাসীকে, দেশের কোটি কোটি নির্যাতিত লাঞ্ছিত, অপমানিত, সর্বহারা জনগণকে ভোলা সম্ভব হল কী করে? আজ যেন সবাই নিজের দিকে চাইতে শিখেছে! নিজের ব্যক্তিগত আশা-আকাংক্ষা যতটা সম্ভব পূর্ণ করে নিতে চায় সকলেই! উদগ্র স্বার্থপরতা সমস্ত আদর্শবাদকে যেন বিদ্রূপ করে চলেছে! প্রেম-প্রীতির উপলব্ধি এবং নিঃস্বার্থ কল্যাণ-বুদ্ধি যেন স্বার্থপরতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে! আবার কি মানুষ সেই শুভবুদ্ধি—সেই কল্যাণময় আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবে? চিন্তা করেন ইন্দুভূষণ বাবু। দেশ যে উন্মাদের মত ধ্বংসের পথে ছুটে চলেছে! কে এই সর্বনাশা গতিবেগ রোধ করবে?

৪

একটু সুস্থ হবার পরই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন ইন্দুভূষণবাবু। কলকাতায় ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী; সেইখানেই

কিছু দিন কাটিয়ে আসবেন ঠিক করে চলে গেলেন, মণিকাদের কিছু না জানিয়েই। একদিন দোতলার ঝুল বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে আছেন তিনি অন্যমনস্কভাবে। বন্ধুর স্ত্রী রেডিও খুলে দিয়েছেন, গান হচ্ছে তাতে :

'দূরে থেকে কেন ডাকো ?
ধরা নাহি দেবে যদি, কেন প্রেম-ছবি আঁকো ?' ......

সুরের ঝরনা ধারায় আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল! অন্তরে কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের আবেগ অনুভব করতে লাগলেন ইন্দুবাবু। মণিকার কথা খুব বেশি মনে হতে লাগল তাঁর। মণিকাও কি এমনি করে ভাবে তাঁর কথা? নিষ্ঠাবান কর্মী তিনি, কোন দুর্বলতাই এ যাবৎ তাঁর ছিল না। স্বাধীনতার পরে এ কী প্রেমের জোয়ার এলো তাঁর হৃদয়ে! অন্যান্য কর্মীদের আদর্শ চ্যুতির মতই এটা তাঁর একটা অপরাধ নয় কি? কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না এই অপরাধ-বোধ; সুরের মাধুর্যে তন্ময় হয়ে গেলেন তিনি।

বন্ধুর স্ত্রী পুষ্পিতা চা এনে রাখলেন ইজি চেয়ারের হাতলে। বললেন, চা খান ঠাকুরপো। কোন সাড়া না পেয়ে বললেন, কী ভাবচেন এমন করে বলুন তো?

—ওঃ, আপনি? গান শুনতে শুনতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম!

—ও তো পচা গান! ওর আর শোনবার কি আছে? কিন্তু ও গানও আপনার ভাল লাগলো?

—মন্দ কি?

—মাসখানেক ধরে অসুখে ভুগতে হয়েচে আপনাকে, একা একা কত কষ্ট পেয়েচেন বলুন তো? বুঝলেন তো এবার, একা থাকার

কত জ্বালা! এবার আমাদের অনুরোধ মত একটা বিয়ে করুন ঠাকুরপো, কেমন?

ইন্দুবাবু হাসলেন পুষ্পিতার কথা শুনে, কোন উত্তর দিলেন না।

—হাসলেন যে? বিয়ে করবেন না আপনি?

—বিয়ে না করে যদি আমি অসময়ে আপনাদের এখানে আসি, তাহলে কি আমাকে দেখবেন না?

—আপনি তো রোজই আসচেন! না সত্যি, আপনি আমার এই অনুরোধটা রাখুন।

—যদি আমি কারুকে ভালবেসে থাকি, আর তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবুও যাকে হোক্ বিয়ে করতেই হবে?

—পুষ্পিতা বললেন, বেশ ত, যাকে ভালবেসেচেন, তাকেই বিয়ে করুন না? পাবার সম্ভাবনা নেই কেন?

—আপনি ত সংসারটাকে খুব সহজ দৃষ্টিতে দেখেন, তাই ওকথা বলতে পারলেন!

—আচ্ছা, কাকে ভালবেসেচেন বলুন আগে, পাওয়া যায় কি না, বিবেচনা করে দেখব। মেয়েটি আপনাকে ভালবাসে ত?

—বাসে বলেই মনে হয়। কিন্তু তাঁদের আপনি চিনবেন না, আর চেষ্টা করেও কিছু হবে না! বলে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ইন্দুবাবু।

পুষ্পিতা বললেন, ভাল যে আপনি বেসেচেন, তা আমি অনুমান করেছিলাম।

ঝি দুখানা এনভেলাপ নিয়ে এসে পুষ্পিতাকে দিলে। পুষ্পিতা একবার চোখ বুলিয়েই চিঠি দুখানা ইন্দুবাবুকে দিলেন। দুখানাই গ্রামের ঠিকানা থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে এখানে এসেছে। আসবার সময় স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারকে এ অনুরোধটা করে এসেছিলেন তিনি। খুলে দেখলেন, একখানি লিখেছে অমলেন্দু আর একখানি লিখেছে মণিকা।

অমলেন্দু লিখেছে, কোথায় যে তুমি চলে গেলে আমাদের কিছু না জানিয়ে, তা আজও জানতে পারি নি। পোষ্টমাষ্টার জানেন, কিন্তু ঠিকানা বলতে রাজী হলেন না, শুধু বললেন, কেউ চিঠি দিলে রিডাইরেক্ট করে পাঠাতে পারেন। এই জন্যে নিরুদ্দেশের যাত্রীর উদ্দেশে চিঠিই লিখলাম। এখন কেমন আছ তুমি? শরীরটা সেরেচে কি? আচ্ছা, এভাবে তোমার সরে পড়ার মানেটা কি বলতে পারো? দিন দিন তুমি যেন রহস্যময় হয়ে উঠচ! মণিকাকে তোমার মনে আছে ত? তার বিয়ে তোমারই এক সহকর্মী কালিদাস-বাবুর সংগে। ইনি এক মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। প্রচুর টাকা করেচেন, নিজের গাড়ী করেচেন, পৈতৃক বেশ বড় বাড়ীও আছে। মণিকা খুব সুখী হবে, কি বল? কিন্তু মণিকাকে যেন ফাঁসির আসামী বলে মনে হচ্চে! মুখে হাসি নেই, কথা নেই, কি যেন সব সময় ভাবে। বৌদি বলেন, মেয়েটাকে কি মেরে ফেলবে তোমরা? ও যাতে সুখী হয়, তাই করা উচিত। অত যাকে ভালবাস সবাই মিলে, সে কিসে সুখী হয়, তা বিবেচনা করবে না? তোমাদের জেদের কাছে বলি দেবে মেয়েটাকে? দাদা, মা, আমি এখন তাঁর দলে। শুধু বাবা বলেন, যেহেতু কথা দিয়েচেন, সেই জন্যে কথার তিনি নড়চড় করতে পারবেন না। তুমি পত্র পাঠ চলে এসো ভাই। বৌদি বলচেন, তোমার সংগে পরামর্শ করা বিশেষ দরকার।

মণিকা লিখেছে, আমরা কি এতই পর হয়ে গিয়েচি আপনার, কোন খবর না দিয়েই চলে যেতে হয়! এ শুধু আমাকে কষ্ট দেওয়া! এবার আপনাদের সকলের কাছ থেকেই চলে যাচ্চি আমি! শেষবারের মত একবার দয়া করে আমাকে দেখা দেবেন—এই আমার অনুরোধ!

দুখানা চিঠিই পুষ্পিতার হাতে তুলে দিলেন ইন্দুভূষণবাবু।

পুষ্পিতা চিঠি পড়ে বললেন, এই মণিকাকেই কি আপনি ভালবাসেন? চিঠির ভাষায় সেই রকমই অনুমান করচি।

ইন্দুবাবু বললেন, আপনি ঠিকই অনুমান করেচেন, একেই আমি ভালবাসি। কিন্তু সেও কি আমাকে ভালবাসে বলে আপনার মনে হয়?

—নিশ্চয়ই। আমাকে নিয়ে যাবেন আপনাদের দেশে? রেণুতো ছেলেমানুষ, আমিও কখনও পাড়াগাঁ দেখিনি! যাবেন নিয়ে আমাদের? আপনার বন্ধুর তো কখনও সময় হবে না! বাংলা দেশে জন্মে বাংলা মায়ের সত্যিকার চেহারা কখনও দেখলাম না! কলকাতাতেই আবদ্ধ রইলাম চিরকাল!

—আপনি কল্পনা করে পাড়াগাঁকে যত সুন্দর ভাবচেন, তত সুন্দর নয়। হয়ত একবার দেখলে আর পাড়াগাঁর নামও মুখে আনবেন না!

—তা হোক্, আপনি নিয়ে চলুন।

—সমীর আপত্তি করবে না?

পুষ্পিতা বললেন, আপত্তি করবেন উনি? কোথাও নিয়ে যেতে পারেন না বলে কত দুঃখ করেন! ওঁর আপত্তির কথা আপনাকে ভাবতে হবে না, উনিই বরং আপনাকে বলবেন। কিন্তু আপনার আপত্তি নেই তো?

—আমার বাড়ীতে আর কেউ নেই, জানেন তো?

—আপনি তো রয়েচেন?

—আচ্ছা, তাই হবে।

পুষ্পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কন্যা ফুলরেণুকে সংবাদটা দিতে গেলেন।

৫

আজ কয়েক দিন হল ইন্দুবাবু বন্ধুপত্নী পুষ্পিতা ও তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে ফুলরেণুকে নিয়ে স্বগ্রামে ফিরে এসেছেন। গ্রামের বৈচিত্র্যে

মুগ্ধ হয়েছেন পুষ্পিতা, রেণুরও খুব খারাপ লাগছে না। আজ মণিকার বিয়ের দিন। ইন্দুবাবু, পুষ্পিতা ও রেণুকে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছেন ক্ষেত্রবাবু, যাবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানিয়ে।

সকলে মিলে মণিকাদের বাড়ীতে এসেছেন। বিয়ে বাড়ী, খুব ধূমধাম। বহু আত্মীয় স্বজনে ভরে গিয়েছে বাড়ী! ইন্দুবাবুরা যেতে তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন মণিকার মা, নির্মলেন্দু, অমলেন্দু ও আভা। আভা পুষ্পিতা ও রেণুকে সংগে করে নিয়ে গেলেন মণিকার কাছে। পরিচয় করিয়ে দিলেন পরস্পরকে। মণিকাকে দেখে পুষ্পিতা বুঝলেন, কী সুগভীর বেদনা মেয়েটি নীরবে বহন করে চলেছে। অত্যন্ত ম্লান তার মুখ, চোখ-মুখ বসে গিয়েছে, চোখের কোণে কালি, কেমন একরকম হয়ে গিয়েছে যেন। আভাকে একান্তে ডেকে পুষ্পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, মণিকার বিয়ে হচ্ছে, অথচ তার চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? অসুখ-বিসুখ হয়েছিল কি?

আভা বললেন, ঠিক অসুখ কিছু হয়নি বটে, কিন্তু একটা বড় দুঃখের ব্যাপার ঘটতে চলেচে ওর জীবনে। ও যাকে অত্যন্ত ভালবাসে, তার সংগে ওর বিয়ে হচ্ছে না।

—কাকে ভালবাসে মণিকা? যাকে ভালবাসে, তার সংগে বিয়ে হওয়ার কি কোন সম্ভাবনাই ছিল না?

—ও ভালবাসে ইন্দুবাবুকে। কিন্তু অসবর্ণ বলে বাবা এই বিয়েতে একেবারেই রাজী নন। আমরা সকলে মিলে তাঁকে বুঝিয়েচি, কোন মতেই তিনি রাজী হন নি।

পুষ্পিতা বললেন, কিন্তু মণিকা তো এই বিয়েতে সুখী হবে না! সবর্ণ—অসবর্ণের প্রশ্নটাই বড় হল? এত বড় ভালবাসা মিথ্যে হয়ে যাবে? আমি জানি, ঠাকুর-পোও মণিকাকে খুব ভালবাসেন! তাঁরও জীবন ব্যর্থ হবে!

*   *   *   *   *

বহু অদ্ভুত ব্যাপারই ঘটে মানুষের জীবনে। ইন্দুবাবু ও মণিকার জীবনেও সেইরকম অভাবিত ঘটনা ঘটল। দেনা-পাওনার সামান্য সূত্র ধরে অত্যন্ত রূঢ় ভাবে ক্ষেত্রমোহনবাবুকে অপমান করে চলে গিয়েছেন কালিদাসবাবু ও তাঁর দলবল! এমন ছোটলোকের মেয়েকে কোনমতেই বিয়ে করতে পারেন না কালিদাসবাবু। রাগে, দুঃখে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন ক্ষেত্রবাবু। শেষ পর্যন্ত পুষ্পিতা, আভা, অমলেন্দু, নির্মলেন্দু ও মণিকার মা যোগমায়ার অনুরোধে ও যুক্তি কৌশলে পরাভূত হয়েছেন তিনি। ইন্দুবাবু এবং মণিকার বিয়েতে আর আপত্তি করলেন না।

অনেক রাত হয়ে গেছে। বাসর ঘর থেকে একে একে বিদায় নিয়েছে বাসর-জাগানিয়া মেয়েরা। পুষ্পিতা ও আভার নির্দেশ মতই এটা হয়েছে।

মণিকা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে ইন্দুবাবুর পানে। ইন্দুবাবুও চাইলেন মণিকার দিকে। গভীর পরিতৃপ্তিতে উভয়ের মন ভরে গেছে! মণিকাকে বুকে টেনে নিয়ে ইন্দুবাবু বললেন, মণি, সত্যিই কি আমি তোমাকে পেলাম!...

মণিকা কোন উত্তর দিলে না, গভীর সুখে ও নিশ্চিন্ত ভাবে ইন্দুবাবুর কাঁধের ওপর মাথা রাখলে সে!

শেষ

ভারতের অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর অকৃত্রিম বান্ধব, বঙ্গ, বিহার,
উড়িষ্যা ও আসাম বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও বাগ্মী,
জাতিভেদ আদি যুগান্তরকারী অর্দ্ধ শতাধিক
গ্রন্থ প্রণেতা, পুনঃপুনঃ রাজনিগৃহীত দেশ-
সেবক, মালদহ সহর কংগ্রেসের
সভাপতি

পণ্ডিত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ

প্রণীত

অস্পৃশ্যতা বর্জনে মহাত্মাজী—দাম ১৲

চতুর্ব্বর্ণ প্রতিষ্ঠা— দাম ১৲

যুগান্তরকারী গ্রন্থ, নিপীড়িত শূদ্রের নূতন বেদ। জলন্ত ও জীবন্ত ভাষায় হৃদয়ের তপ্ত শোণিতে লিখিত। নব যুগ সৃষ্টিকারী, পদদলিত নরনারায়ণের সঞ্জীবনী সুধা। সামাজিক তুল্যাধিকার ও সাম্যপ্রার্থী প্রত্যেক জাতি ও ব্যক্তির অবশ্য পাঠ্য, গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় গৃহে গৃহে ও প্রত্যেক পাঠাগারে রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ মূল্যবান গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে ভারতের কোন ভাষায় এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ্য আভি-জাত্যের পুতিগন্ধময় নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া ও বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে শেষ করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অভিমত :

ভুবন বরেণ্য মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন :—"আপনি তো আমারও অনেক আগে থেকে অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করেছেন।" (অনুবাদ)

"Long before Gandhiji and others commenced there works for the uplift of the so-called depressed classes Digindra Babu had been in the field.

[Hindusthan Standered, March 23/1940.]

রাষ্ট্রপতি ও নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু:—আপনি কি সামান্য অভিমত বা প্রশংসা পত্র চাচ্ছেন,—আমি তো আপনার Admirer (গুণমুগ্ধ অনুরক্ত)। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের প্রতি) "সিরাজগঞ্জ যদি যান তবে 'জাতিভেদ' বইখানির গ্রন্থকার দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি ভীমরুলের চাকে বসেই ভীমরুলের দলকে খোঁচা দিচ্ছেন। এটা বড় সহজ কাজ নয়। কলকাতায় বসে সমাজ সংস্কারের কথা বলা সহজ, কিন্তু পল্লী-সমাজের বুকে বসে, সমাজকে সাহস করে ঘা দেওয়া ভারি কঠিন, তিনি তাই করছেন।" বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (পরবর্ত্তী কালের আলিপুরের জেলা জজ অনুকূলচন্দ্র সান্ন্যালের প্রতি) "তোমার উপহার দেওয়া বইখানা আমরা উভয়ে প'ড়ে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেছি, তোমার লেখক বন্ধুকে আমাদের একথা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাবে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়:—"ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্য হতে আমরা কত মহাপুরুষকে পেয়েছি। আমাদের দিগিন্দ্রবাবুও ব্রাহ্মণ সন্তান। জাতির মর্মবেদনায় ইনি ব্যথিত হয়েছেন—ইঁহার পাণ্ডিত্যও যথেষ্ট আছে; বাংলায় এমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কে আছেন,—যিনি ইঁহার সামনে সাহস করে শাস্ত্রের বচন আওড়াতে পারেন। ইনি জাতির মুক্তির জন্য কত বই লিখেছেন,—সমাজের নিকট কত নির্যাতন ভোগ করেছেন।

প্রাপ্তিস্থান:—২৪।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আর্য্যরত্ন কার্য্যালয়